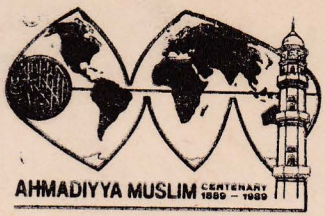

কুখ্যাত স্যাটানিক ভার্সেস সম্পর্কে দু'টো খুতবা

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)

প্রকাশনায়ঃ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

একটি জুবিলী প্রকাশনা
প্রথম সংস্করণ
১লা অক্টোবর, ১৯৮৯

মুদ্রণে ঃ
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

A Jubilee Publication

SATANIC VERSES SAMPARKE DUTO KHUTBA

by

Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV

দু'টো কথা

সালমান রুশদী প্রণীত 'স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম জাহানে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম নেতা এর প্রতিবাদে বিভিন্ন পন্থা অনুসরণের কথা বলেন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) তাশাহুদ তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পরে জুম'আর দু'টো খুতবায় (উর্দুতে) রুশদী ফেৎনার প্রতিকারের সুষ্ঠু পথ-নির্দেশনা দেন। ঐ দু'টো খুতবার বাংলা তর্জমা এখানে সন্নিবেশ করা হলো।

খুতবা দু'টো তর্জমা করেছেন মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী (সদর মুরব্বী) এবং সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, সেক্রেটারী তালীম ও তরবীয়ত, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ।

আশা করি এতে সহৃদয় পাঠক চিন্তার প্রচুর খোরাক ও উপাদান পাবেন। এ পুস্তিকা প্রকাশনার সাথে সংযুক্ত সবার জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে কল্যাণ কামনা করছি।

সেক্রেটারী পাবলিকেশন
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আজ আমি জামা'তের সদস্যদেরকে সালমান রুশদীর শয়তানী বই এর সঠিক চিত্র ও পটভূমি সম্বন্ধে অবহিত করতে চাই এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিকল্পনা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত তাও বলতে চাই।

এই বই এর পটভূমি কি? প্রথম দৃষ্টিই পটভূমির উপর পড়ে। এ প্রসঙ্গে অনেক চিন্তাবিদ এবং গুণী ব্যক্তিরা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বইটি কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয় বরং এর পশ্চাতে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু এই পটভূমির পিছনে আর একটি সুদীর্ঘ পটভূমিও রয়েছে যার মাঝে এই ষড়যন্ত্রের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল। তাই, ব্যাপারটিকে গোড়া থেকেই বুঝার প্রয়োজন। বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদরা (Orientalists) ভদ্রতা ও শালিনতার আড়ালে ইসলামের উপর এখন এমনভাবে আক্রমণ চালায় যেন শালীনতা ভদ্রতাও বজায় থাকে এবং সেই সাথে ইসলামের বক্ষঃও ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা বশতঃ অনেক মুসলমান এ কথা বুঝতেও পারে না যে, নোংরামী আর বজ্জাতি যা খৃষ্টানমতাবলম্বী প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞরা অন্ধকার যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল আজও সেই নোংরামী ও শয়তানী চালানো হচ্ছে। কেবল ঢংটা পাল্টানো হয়েছে। এই দীর্ঘ পটভূমি

পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারব যে, আগে পাশ্চাত্যের বেশীরভাগ প্রাচ্য-বিশারদ ছিলেন খৃষ্টান-পাদ্রী আর তারা সরাসরি খৃষ্ট মতবাদের সেবক ছিলেন। সে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে যা লেখা হয়েছে সে সবগুলো বড়ই অশ্লীল আক্রমণ ছিল ; নগ্ন ও প্রকাশ্য ছিল। তাদের কার্যপ্রণালীর যে ধরণ ছিল তাহলো : যে সমস্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন বিবরণ মুসলমানদেরই কোন কোন বই এ পাওয়া যায় সেগুলোকেই জোরালোভাবে তারা পরিবেশন করেছেন। তারা এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের থেকে কোন কথা বলছেন না বা এ ধরণের কথা তারা জ্ঞানতঃ চিন্তাও করেন না। তারা বলতে চান : 'আমরা তো কেবল গবেষক ও বিশারদ।' এই জন্যে তারা যা লিখেছেন তার মূল তারা ইসলামী বই পুস্তক থেকে খুঁজে বের করেছেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে 'ওয়াকেদী'র দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছেন। আবার 'তাবারী'ও অসাবধানতা বশতঃ কিছু অসংগত ও ভিত্তিহীন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যার উপর এরা ভিত্তি স্থাপন করে থাকেন। একই সাথে পাশ্চাত্যে তারা ইসলামের সেই চিত্রটা অত্যন্ত সাধুভাবে প্রকাশ করেন এবং বলেন 'এরা তো হচ্ছেন ইসলামের মর্যাদাশীল ও সর্বজনবিদিত বুযুর্গ ব্যক্তি এবং এই সমস্ত কথা ও ঘটনা যে এঁদেরই বই থেকে উদ্ধৃত। অতএব, প্রকৃত গবেষণালব্ধ জ্ঞান এটাই, যার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে।' অথচ এ সমস্ত তথাকথিত ভিত্তিহীন বর্ণনা ও

কাহিনীর মোকাবিলায় ইসলামের কাছে অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য রেওয়ায়াত ও প্রমাণাদি ছিল এবং আছে যেমন কুরআন শরীফে এমন স্পষ্ট উক্তি ও বর্ণনাসমূহ আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি উল্লেখিত বর্ণনাদি কখনই গ্রহণ করতে পারেন না। ঘটনার শত শত বছর পরে ঐ সমস্ত অলীক বিবরণগুলো একত্রিত করা হয় এবং যাদের বেশীর ভাগ বর্ণনাকারী ছিল পাকা মিথ্যুক। মুসলমান জ্ঞান বিশারদগণ ঐ সব বর্ণনাকারীদের চরিত্র ও অবস্থা সম্বন্ধে যে গবেষণা চালান সেই গবেষণানুসারে তারা মিথ্যুক, পাপাচারী ও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যভিচারীও সাব্যস্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞরা এ সব কথা ভালভাবে পড়েছেন। তাদের মধ্যে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন যারা এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও পারদর্শিতা রাখতেন। তারা ইসলামী প্রকাশনা ও বই-পত্র অনেক পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু পরিশেষে বেছে এমন সব উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন যা ইসলামের বিরুদ্ধ-আক্রমণে ব্যবহার করা যায়। তারা বাহ্যতঃ সততা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল তাদের ভয়ানক শত্রুতা, যা তারা নিজেদের প্রকাশনায় ও গবেষণায় অবলম্বন করতেন।

অতঃপর যুগের পরিবর্তন ঘটে। আমি যখন ১৯৮২তে ইংল্যাণ্ড সফরে আসি তখন এ বিষয়ে বিভিন্ন খুৎবায় ও অনুষ্ঠানে আলোকপাতও করি। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞরা তাদের পলিসির ধরণ বদলে নেন এবং প্রচ্ছন্ন

ভাবে আক্রমণ করা আরম্ভ করেন। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়াদি বেছে নেন যেগুলিকে ইসলামী দেশসমূহে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে পরিচালনা করেন। তারা এগুলোকে তাদের পক্ষে কাজ করবে বলে মনে করেন, যেমন মুরতাদের শাস্তি হত্যা; এ বিষয়ে মুসলমান শাসকদিগকে এরা পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। কোন মাননীয় এবং সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপমানজনক আচরণ বা শব্দ উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা, বিরোধিতার সময় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণ না করা ইত্যাদি বিষয়াদি এবং আত্মমর্যাদা বোধের ভুল প্রয়োগ করা, নিজ হাতে আইনকে নিয়ে নেয়া, প্রত্যেক বিরোধীকে শক্তভাবে দমন করা প্রভৃতি বিষয়ে এরা বেশী বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এগুলোকে ইসলামের শিক্ষা বলে চালিয়ে দেন। পক্ষান্তরে, এ যুগের ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের স্বার্থে যেহেতু এই ধরণের ইসলামী যুক্তি-প্রমাণাদির প্রয়োজনও ছিল যাতে তারা নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেহেতু এ বিষয়গুলোকে তারা নিজেদের স্বপক্ষে গ্রহণ করেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ যুগে যে মহান এহ্সান (অনুগ্রহ) করেছেন তার ব্যাপকতা অনেক। তবে এটি তাঁর বিশেষ অবদান যে, তিনি ঐ ধরণের সমস্ত রেওয়ায়াতকে গবেষণার মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছেন, যেগুলো দ্বারা ইসলামের চিত্র ভয়ানক আকারে তুলে ধরা হচ্ছিল। তিনি ইসলামকে এমন এক পবিত্র ধর্মরূপে জগতের

সামনে তুলে ধরেন যা নিজের সৌন্দর্য দ্বারাই মানুষের মনকে বিমোহিত করতে সক্ষম। এর কারণে পৃথিবীর আলেমরা অনেক চীৎকার শুরু করে দেয় এবং বিরোধীরা আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে। তারা বলে "এরা ইসলামকে বিকৃতরূপে পরিবেশন করছে।"

সালমান রুশদীর বইতে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তার সবক'টি এমন ধরণের রেওয়ায়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেগুলোকে আহ্‌মদীয়াত অগ্রহণযোগ্য বলেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আহ্‌মদীয়াতের ঘোর বিরোধিতা হয় এবং ঐ সব অসমর্থিত ও বিভ্রান্তিকর রেওয়ায়াতগুলোকে সঠিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই সব রেওয়ায়াতের ভিত্তিতেই সে (সালমান রুশদী) একটা উপন্যাস রচনা করে। তার ভাষা এমনই ইতর ও অশ্রাব্য যা কেবল অলিগলির নষ্ট কিশোরদের মুখেই শুনা যায়। সে এই ভাষা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), তাঁর পবিত্র বিবিগণের এবং আরও কিছু বুযুর্গের সম্বন্ধে ব্যবহার করেছে। প্রথমবার যখন এই বইটার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, তখন আমার তো আগাগোড়া এই বইটা পড়ার মত অবস্থাই ছিল না। আমি কয়েকজন আহ্‌মদীকে এই কাজে নিয়োজিত করি যেন তারা এই বই এর বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচিত করে আমার সামনে আনেন, যাতে এই বই এর মূল বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ধরা যায়, যদিও সেই নির্বাচিত উদ্ধৃত অংশগুলো পড়াটাও আমার জন্য একটি আধ্যাত্মিক

নির্যাতন ছিল। তবু সেগুলো পড়ে আমি এটুকুই নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি যে, এই বইটা মাত্র একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল কখনো হতে পারে না। সালমান রুশদীর মত একটা মানুষ, ধর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, একটা নাস্তিকতার পরিবেশেই সে জন্ম নেয় এবং সেই পরিবেশেই সে বড় হতে থাকে এবং সে পরে এমন একটা বয়সে ইংল্যাণ্ডে আসে যখন সে আসা মাত্রই এখানকার অসভ্যতা এবং পার্থিবতার মলিনতার সাথে জড়িয়ে পড়ে ; ধর্মের সাথে যে তার মোটেও সম্পর্ক নেই একথা সে নিজেও স্বীকার করেছে ; হঠাৎ করে সেই মানুষটাই সেই বিষয়গুলিকেই সূক্ষ্মভাবে জেনে ফেলল যেগুলো এক পর্যায়ে ইসলামের শত্রুরা বিশেষতঃ খৃষ্টান পাদ্রীরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করত। বলাবাহুল্য, এটা কোন একক আকস্মিক ঘটনা নয়। এমন সমস্ত অপবাদের একটা চোঁয়ানো রস এই পুস্তকে জমা করা হয়েছে যেগুলোর ইতিকথা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত। সমস্ত অপবাদগুলো যদি নাও এসে থাকে তবে সেই অংশগুলো অবশ্যই উল্লেখিত হয়েছে যেগুলো আজকের পাশ্চাত্যের মানসিকতার সঙ্গে বেশী মানান-সই। যেহেতু পাশ্চাত্যে অশ্লীলতা ছেয়ে গেছে, সেহেতু যৌন বিষয়ক বই-পত্র এখানে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। এজন্যে বিশেষ এক ধরণের রেওয়ায়াতের (বিবরণের) উপর ভিত্তি করে সে (সালমান রুশদী) কিছু সংখ্যক বুযুর্গকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত অশ্লীল ও যৌন আবেদন উদ্দীপক এই বইটা রচনা

করে ; এবং এর ধরণটা এমন যে, এটা যেন একটা গল্প মাত্র।

এই বইটার অনেক সমালোচনা হয়েছে। এই খুতবায় আমি সবগুলোর বিশ্লেষণ করব না। কিছু সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরব। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আসলে এ বইটা কোন মতেই সালমান রুশদীর একার নয়। সে নিজের ঈমানকে নয় (কেননা তার কোন ঈমান নেই) বরং নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছে। একটা ধনী সমাজ পয়সার বিনিময়ে এ কাজটা করিয়েছে। তার ক'জন নিকট বন্ধু তাকে পরামর্শ পর্যন্ত দিয়েছিলেন যে, 'দেখ এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার তুমি এর মাঝে নিজেকে জড়িও না' টেলিভিশনের কোন কোন অনুষ্ঠানে এর উল্লেখও হয়েছে। কিন্তু এ সত্বেও, টাকার পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, সে অস্বীকার করতে পারেনি। আর সে নিজে যেহেতু ধর্মহীন এবং বল্গাহীন এবং তার ব্যক্তিগত জীবনেও যেহেতু ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখার প্রয়োজন হয় না সেহেতু সে একদম লাগামহীন হয়ে পড়ে। আর মনে হয় তাকে বলা হয়েছিল এমন একটা কিছু লিখো যার পরিণতিতে ইসলামের যে ভাবমূর্তি পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হচ্ছে সেটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ইসলামের যে শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে, ইসলাম যে প্রচারিত হচ্ছে এই ধরণের প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামের সেই প্রভাবকে যেন পাশ্চাত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া যায়। আর বিগত শতাব্দীগুলোতে ইসলামের যে ভয়ংকর চিত্র পাশ্চাত্যে তুলে ধরা হয়েছিল তা যেন পুনরায় প্রকাশিত হয়ে উঠে। যার ফল-

শ্রুতিতে সমস্ত প্রচেষ্টা যা প্রাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচারের স্বপক্ষে চালানো হচ্ছে তা যেন সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের পটভূমি।

উদাহরণস্বরূপ একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যায়, যা লেখকের মাথায় আপনা আপনি আসতেই পারে না। এমন একটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যা ইসলাম ও খৃষ্টান মতবাদের মধ্যে যুক্তি-প্রমাণাদির বিতর্কে সত্যতা প্রমাণের দ্বন্দ্বে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আর এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ব্যক্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে। মুসলমানরা সব সময়ে এটা বলে আসছে যে, যেহেতু হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর সেহেতু ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ দানের অঙ্গীকার ছিল সেই অঙ্গীকারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও একজন অংশীদার। হুযূর (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো রয়েছে তার সূচনাও এখান থেকেই। এটাই প্রথম থেকে মুসলমানদের ধারণা। এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খৃষ্টানরা নিজেদের স্বপক্ষে এ কথাটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হযরত হাজেরা হযরত ইব্রাহীমের স্বাভাবিক প্রথা ও বিধিমতে স্ত্রী ছিলেন না বরং একজন দাসী ছিলেন, যার সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দান করেছিলেন হযরত সায়েরা। তাই এই সন্তান (অর্থাৎ ইসমাঈল-আঃ) জায়েয সন্তান নয়, আর যদি বা জায়েযও হয় তবুও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবার মত জায়েয কিছুতেই

নয়। তর্কটা খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বার বার হয়েছে। আহ্‌মদীয়া লিটারেচার এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা এ বিষয়ে খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে নিরুত্তর ও নির্বাক করে দেয়। আহ্‌মদীয়া লিটারেচার প্রমাণ করে যে, তাদের এই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, নেই কোন ভিত্তি। এখন দেখুন, এই সালমান রুশদীর মত মানুষটা নাস্তিকতার পরিবেশে লালিত হলেও সহসা তাকে ইসলামের শত্রু বলে মেনে নেয়া যায় না। হঠাৎ তার ধর্মীয় জ্ঞান ও পড়াশুনা এত কি গভীর হয়ে গেল যে, সে ইসলাম ও খৃষ্ট মতবাদের মাঝে মৌলিক মূল দ্বন্দ্বের বিষয়াদিও জেনে ফেললো যার নিষ্পত্তির উপর ইসলামের জয় পরাজয় নির্ভরশীল? এ কথাটা ঐ ধরণের একটা মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তাও করা যায় না। সে নিজে স্বীকার করেছে যে, এ ধরণের পড়াশুনা তার মোটেই নেই। এক পর্যায়ে সে নিজের পড়াশুনার ভিত্তিস্বরূপ 'তাবারী'র উদ্ধৃতি দেয়। কিন্তু 'তাবারী'তে এ ধরণের কোন ঘটনা উল্লেখিত হয়নি। নিশ্চয়ই খৃষ্টান গোষ্ঠীসমূহের পক্ষ থেকে তাকে এমন সব উদ্ধৃতি সরবরাহ করা হয়েছে যা ইসলামের মূলের উপর গভীর আঘাত হানতে চায়, যে আঘাত ইতিমধ্যে ইতিহাসের গভীরে নিহিত এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত যা বিস্তৃত। তার বই-এ সে ইসমাঈল (আঃ)-এর ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করেছে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) অবৈধ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে

এবং অত্যন্ত অশ্লীল ও মর্মপীড়াদায়ক শব্দাবলী ব্যবহার করেছে। যদি সে সত্যিই ধর্মহীন হত তবে অন্যান্য নবীদের উপরও আক্রমণ চালাত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তার আক্রমণ বিশেষ-ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতৃপুরুষ এবং ইসলামের বিশেষ বুযুর্গদের উপর সীমাবদ্ধ।

আবার সাহাবীদের (রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম) সম্বন্ধে ওর আক্রমণ যখন আমি পর্যালোচনা করি তখন উম্মাহাতুল মো'মেনীনদের উপর অপবাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে তো বোধ-গম্য হল (কেননা এই ধরণের শয়তান প্রকৃতির মানুষ সব সময়ে এই কাজটাই করে এসেছে) কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে, এতে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে বিশেষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু কেন? কাজেই আরেকটা ব্যাপার এথেকে বুঝতে পারলাম যে, ইরানের সঙ্গেতো এসব জাতির ইদানিং প্রচণ্ড শত্রুতা চলছে কারণ ইরান যদিও আজ পরাজিত তবু সে কখনো পাশ্চাত্যের প্রভুত্বকে মেনে নেয়নি। ইরান বোকামী বশতঃ পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে, নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে কিংবা আত্মঘাতী হয়েছে—কিন্তু যাই করে থাকুক না কেন, শত্রুর উপর আঘাত সে অবশ্যই হেনেছে, নিজের শির নত করেনি পাশ্চাত্যের কাছে। এই ব্যাপারটা পাশ্চাত্যের অহমিকায় একটা প্রচণ্ড আঘাত যা তাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যে কারণে তারা সব কিছু ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তারা খোমেনীকে কোনমতে ছাড়তে রাজী নয়; কিংবা ইরানী-

দের কখনো ক্ষমা করতে রাজী নয়। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী এবং একমাত্র ইরানী সাহাবী ছিলেন। তাঁকে আক্রমণের কেন্দ্র বানালে ইরানীরা অবশ্যই কষ্ট পাবে, অতএব সালমান ফারসীকে বিশেষভাবে অপবাদের শিকার বানাও — এটাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কার্যতঃ তাই হয়েছে। তারা হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উপরেও আক্রমণ করেছে। কিন্তু তারা জানতো যে এই আক্রমণটা শিয়াদের এতটা ব্যথিত নাও করতে পারে— এই জন্য সালমান ফারসী (রাঃ)-কে বেছে নেয়া হয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ)-কেও নির্বাচন করা যেত, হযরত উমর (রাঃ)-কেও নেয়া যেত, হযরত উসমান কিংবা হযরত আলী (রাঃ)-কেও তো নিশানা বানানো যেতে পারত। কিন্তু এঁদেরকে আক্রমণ না করে বিশেষভাবে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে নিশানা বানানো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই সম্পূর্ণ পুস্তকটা একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ এবং বড়ই দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে এ কাজটা সম্পন্ন করা হয়েছে যেন সঠিক স্থানেই আঘাত হানা যায়। সুতরাং এই বইটা কেবল নোংড়ামীর একটা স্তূপ নয় বরং পবিত্র ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করেই এই নোংড়ামী ছোঁড়া হয়েছে। মূল ষড়যন্ত্র এটাই, মুসলমানরা যেন অত্যন্ত মর্মন্তুদ দুঃখ পায় অথচ তাদের করারও কিছু না থাকে। কাজেই এই বইয়ের পেছনে একটা ইরান বিরোধী পলিসিও কাজ করেছে।

আর একটা মোনাফেকীর (কপটতা) পলিসিও এর পট-ভূমিতে রয়েছে। কমপক্ষে ১৫/২০ বছর যাবৎ পাশ্চাত্যের একটা পলিসি এই যে, তারা এমন কয়েকটা ইসলামী রাষ্ট্রের বন্ধু বনে রয়েছে, ও এদের সমর্থন করছে, যারা ইসলামের শিক্ষাকে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের শিক্ষা হিসেবে প্রচার করে থাকে এবং মতবিরোধকে কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করতে চায়। এই বন্ধুত্ব ও সমর্থন এ জন্য প্রদান করা হয়, যেন এই দেশগুলো নিজ নিজ এলাকায় ইসলামী শিক্ষার বলে কমিউ-নিজমকে দমন করে এবং সেই সাথে পাশ্চাত্যের অন্যান্য শত্রুকেও একই তলোয়ার দ্বারা ধ্বংস করতে পারে, এটাই তাদের পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটির দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে, যখন এরা নিজেদের দেশে ইসলামের নামে অত্যাচার করে আর নির্যাতন চালায় তখন পাশ্চাত্যে তা বিষদভাবে প্রচার করা হয়, এবং তার মাধ্যমে ইসলামের একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি তুলে ধরা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, একদিকে সউদী আরব সম্পূর্ণ-ভাবে আমেরিকার সমর্থন-পুষ্ট অথচ একবার যখন রাজ পরি-বারের এক মেয়েকে ব্যভিচারের অভিযোগে সউদী সরকার মৃত্যুদণ্ড দিল তখন আমেরিকায় সেই ঘটনাকে বাড়িয়ে ফুলিয়ে রং দিয়ে অনেক ছায়াছবি তৈরী করা হলো এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ানো হলো। সউদী আরব এ কারণে জোর প্রতিবাদও জানিয়েছে। অনুরূপভাবে আমেরিকান সংবাদপত্র-গুলো সব সময় সউদী আরবের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে

আক্রমণ চালিয়ে আসছে। অথচ সমস্ত কাজ কর্মে তারা সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট ছিল। তাই নিজেদেরকে ইসলামের এই ভয়ানক রূপ থেকে বাঁচানোর জন্য একদিকে তো তারা সেই 'ভয়ংকর' ইসলামকে শক্তিশালী করতে থাকে অপরদিকে নিজেদের দেশে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের তথাকথিত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হোক, কিন্তু অনৈসলামিক পৃথিবীতে এটা যেন প্রচলিত না হয়। খোমেনী এই ধারণাটিকে বদলানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেভাবে এই প্রচেষ্টা চালানো উচিত ছিল সেভাবে হয়নি, বরং এমনভাবে হয়েছে যা ইসলামের জন্য আরও দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খোমেনীর সাথে আমাদের কোন নীতিগত সাদৃশ্য নেই বরং ধর্ম বিষয়ে আমাদের সাথে মৌলিক মতবিরোধ রয়েছে। তিনি সব ধরণের শিয়া মতবাদের মূল বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আমরা তা বিশ্বাস করি না এবং আহ্‌লে সুন্নতের সাথে আমরা একমত। কিন্তু তা সত্বেও তাক্‌ওয়া ও সততার খাতিরে যেটা সত্য সেটাকে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। খোমেনী যা কিছু করেছেন, যদিও সাংঘাতিক ভুল করেছেন, তথাপি তার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইমাম খোমেনী আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামের জন্য নির্বোধ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রে মোনাফেকী (কপটতা) দেখা যায় না। এবার আমার হল্যাণ্ড সফরের সময় ন্যাশনাল প্রেসের সাক্ষাৎকার

কালে তারা চাচ্ছিল যে, আমি বলি, ইমাম খোমেনী সাহেব যে কথাটা বলেছেন তা নিছক একটা রাজনৈতিক চাল। কিন্তু আমি তাদের বললাম, 'না এরূপ অবশ্যই নয়, আপনারা প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন, আমি আপনাদের অভিমত সঠিক মনে করি না।" অবশ্য, খোমেনী সাহেবের ইসলাম হল ইসলামের একটা বিকৃত চিত্র। আমি এটাও বলি যে, এটা ইসলামের বড়ই ভয়ানক রূপ। তাঁর সাথে আমি কোনভাবেই একমত নই। কিন্তু ইমাম খোমেনী সাহেবের চরিত্রে আমি এখনো এমন কিছু পাইনি যাতে বলতে পারি যে, খোমেনী সাহেব জেনে শুনে মিথ্যা বলছেন, তিনি বলেন এক আর করেন আর এক। যে ভয়ঙ্কর ইসলামকে তিনি পরিবেশন করেছেন তার উপর কার্যতঃ আমল করেও তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এত রক্তপাত হয়েছে। আমি পাশ্চাত্যবাসীদের বলেছি, আসল প্রশ্ন এই যে, তোমরা খোমেনীর ব্যাপারে এত সোচ্চার কেন? খোমেনীর ব্যাপারে প্রকৃত কষ্ট এজন্য নয় যে, তিনি সত্যি সত্যিই পাশ্চাত্যবাসীদের কোন ক্ষতি সাধন করেছেন। পাশ্চাত্যের আসল ধারণা এই যে ইসলামকে অবশ্যই বশীভূত রাখতে হবে কিংবা তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোকে অধীনস্থ করতেই হবে — এটাকে খোমেনী উল্টে দিয়েছেন। এটাই এদের কষ্টের প্রকৃত কারণ। তা না হলে খোমেনী সাহেবের 'ভয়ানক' ইসলাম আগাগোড়া কেবল ইসলামেরই ক্ষতি সাধন করেছে। আমি বার বার প্রত্যেক

প্রেস কনফেরেন্সে এদেরকে বুঝিয়েছি যে, খোমেনী তো আপনাদের অনেক বেশী উপকার করেছেন, আর আপনারা নিতান্তই অকৃজ্ঞতা দেখিয়ে সেই বেচারার পেছনে লেগেছেন। খোমেনী এমন এক যুদ্ধ লড়েছেন, আর এত দীর্ঘকাল ধরে লড়েছেন যার ফলে সমস্ত আরবের মুসলিম দেশের তেল সম্পদের বেশীর ভাগ অংশ আপনাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। আর এই অর্থের বিনিময়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং সেকেলে অস্ত্র তাদেরকে দেয়া হয়েছে। যখন আমি এমনটা বলি তখন জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বলে থাকি। কেননা এমন বহু অস্ত্র-সস্ত্র আছে যা প্রতিনিয়ত টেকনোলজির উন্নতির সাথে সাথে পুরোনো হতে থাকে। অতীত যুগে এ ধরণের বিবর্তন পঞ্চাশ বছর পর কখনোবা আসত, আর কোন বিশেষ ধরণের অস্ত্র পুরোনো হলে বর্জন ও পরিত্যাগ করা হত। আর বর্তমানেতো এমন ঘটনা প্রতি বছরই কখনো বা দু'বার ঘটে যায়। যে সমস্ত অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে ব্যবহারযোগ্য থাকে না যেমন ধরুন রাশিয়া কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করে ফেলেছে এখন আমেরিকার পুরোনো বন্দুক, ট্যাঙ্ক কিংবা জাহাজ কি কাজে লাগবে? তাই এ সব অস্ত্র অকেজো বলে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হত কিংবা যতদূর সম্ভব নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন অস্ত্রে রূপান্তর করা হত। একাজে অনেক খরচও ছিল। এরা এ ধরণের সমস্ত অকেজো অস্ত্রের স্তুপ তেলের পরিবর্তে বিক্রি করেছে। খোমেনী এদের এত বড় উপকারী যে—আপনারা জানেন, কিছু

কাল আগ পর্যন্ত আমেরিকার (Budget Deficit) বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭৩ বিলিয়ন ডলার। চিন্তা করুন, বিলিয়ন কত প্রকাণ্ড একটা অঙ্ক তার উপর আবার ডলারে। এটা এত বিরাট অঙ্ক যে, এই অর্থ দ্বারা অনায়াসে চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝে কয়েকটি পথ নির্মাণ করা সম্ভব! ইরাক-ইরান যুদ্ধে কেবল ইরান যে অর্থ ব্যয় করেছে, যার সিংহ ভাগ পাশ্চাত্য থেকে অস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ ৪০০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ আমেরিকার আর্থিক ঘাটতির প্রায় দ্বিগুণ বরং আড়াই গুণ বেশী অর্থ! এ সব অর্থ কোথায় গেছে? এই সব উন্নত দেশগুলোর হাতেই তো এই অর্থ গেছে। আর ঐ অস্ত্র দিয়ে কে মরেছে? খৃষ্টান? ইহুদী কিংবা নাস্তিকরা মরেছে? না, মুসলমান ছাড়া আর কেউ মারা পড়েনি। হয় শীয়া মুসলমান মরেছে নয় সুন্নী মুসলমান মরেছে। এছাড়া সউদী আরব, ইরাক আর অন্যান্য আরব দেশসমূহের এ যুদ্ধ পরিচালনায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে সেটা তো আলাদা আছেই। আমি পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারব না, তবে অসংখ্য টাকা এতে যোগান দেয়া হয়েছে। আর মোটামুটি তেল সম্পদের সবটাই এদের হাতে পানির দামে চলে গেছে। তাহলে খোমেনী ওদের শত্রু হলেন কেমন করে? মরলো তো মুসলমান, বিরোধ হ'ল তো তাও মুসলমানদের মধ্যেই হ'ল। অত্যাচার যা হয়েছে তা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর করেছে। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের দুর্নাম করার সুযোগ

তিনি আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তবুও আপনাদের প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয় না। তাই প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিশোধ হচ্ছে তাদের সেই অহমিকা ভাঙার কারণে, যার উল্লেখ আমি করেছি। আর এটাকে কখনোই তারা ক্ষমা করতে পারে না। তাই খোমেনী যা কিছুই করে থাকুন না কেন তার সাথে আমি একমত নই। তিনি নিজের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছেন, নিজের জাতির উপর অত্যাচার করেছেন, ইসলামী বিশ্বের উপর অত্যাচার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি যেটাকে মিথ্যা বলে জেনেছেন, বুঝেছেন তার সামনে মাথা নত করেন নি। এটা সেই মর্মপীড়া যা কয়েক শতাব্দী ধরেও এরা এত বেশী অনুভব করে নি। তাই তাঁকে ক্ষমা করতে এরা প্রস্তুত নয়। আর একই কারণে যখন খোমেনী সাহেব এই নোংড়া বইটা লিখার জন্যে সালমান রুশদীকে হত্যা করার ফত্ওয়া দান করেন তখন এদের প্রতিক্রিয়া বড়ই সাংঘাতিক ও ভারসাম্যহীন হয়ে ওঠে। একদিকে তারা ইসলামের দুর্নাম করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল, আর অন্যদিকে বড়াই করে বলা আরম্ভ করল — 'মানুষের বাক্স্বাধীনতার অধিকার নব্য সভ্যতার কত বড় একটা অবদান! আমরা এর উপর আক্রমণ সহ্য করব না। সে কে যে, ভাষার আক্রমণের পরিবর্তে দৈহিক আক্রমণ চালায়, আর তাও আমাদের নাগরিকের বিরুদ্ধে?' এখন দেখার বিষয়, একদিকে সালমান রুশদীর পক্ষে এই অসাধারণ সমর্থন যে, সহসা সমগ্র

ইউরোপের ঐক্যমত, অপর দিকে এর পেছনে আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন, এমন কি আপন কুটনীতিকদের ফেরৎ পাঠানো। এটা কি ধরণের যুক্তিযুক্ত বিষয়? যখন কি না এদের নিজের দেশের আহ্‌মদীদের হত্যা করার ফত্‌ওয়া দেওয়া হয় এবং তা কাগজ-পত্রে প্রকাশিত হয়, আর আমার মাথার মূল্য ৪০ হাজার পাউণ্ড নির্ধারণ করা হয়, তখন কিন্তু তাতে এরা কর্ণপাতও করেনি; এমন কি ক'দিন আগেও একজন তথাকথিত আলেম এখানে আসেন এবং ফত্‌ওয়া দেন 'প্রত্যেক আহ্‌মদী ওয়াজে-বুল কাতল (হত্যার যোগ্য)। সুতরাং সমস্যার সমাধান এদেরকে হত্যার মাঝেই নিহিত রয়েছে।' যখন একজন আহ্‌মদী এ বিষয়ে এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, তখন তাকে উত্তর দেয়া হ'ল — 'আমরা এ বিষয়ে এখনো সন্দিহান যে ফত্‌ওয়া প্রদানকারী ভদ্রলোক কোন অপরাধ করেছেন কি না!' একদিকে যে জাতি নিজের দেশে একজনের বিরুদ্ধে নয় বরং তাদের দেশের নাগরিক পুরো একটা জামা'ত যে জামা'ত সম্পূর্ণ নির্দোষ, যারা কোন অপরাধ করেনি, কাউকে মনে কষ্ট দেয়নি, সেই জামা'তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফত্‌ওয়ার ব্যাপারে উক্ত মনোভাব দেখায়, সে জাতির হঠাৎ খোমেনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কেবল এই কারণে যে তিনি হত্যার ফত্‌ওয়া দিয়েছেন, এতে এই ব্যাপারটা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এখানে রাজনৈতিক চাল চালা হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিষ্টাচার বা ব্যক্তি স্বাধীনতার উল্লেখ

কেবল লোক দেখানোর জন্যেই। এতে কিছু প্রতিশোধের স্পৃহা, কিছু পূর্বেকার শত্রুতা, কিছু জমানো ঘৃণা রয়েছে যা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর বর্তমানে তা-ই হচ্ছে।

কুরআন করীম আত্মরক্ষার কেবল অনুমতিই দেয় না বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে আবশ্যক বলে ঘোষণা করে। আর প্রত্যেক সীমান্তে ঘোড়া প্রস্তুত রাখার আদেশ প্রদান করে। তা আদর্শগত সীমানাই হোক কিংবা ভৌগলিক সীমানাই হোক। কিন্তু, একই সঙ্গে ইসলাম কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিশোধের অনুমতি দেয় না, এবং কোন কোন ধরণের আক্রমণ থেকে বিরত রাখে। সে গুলোর মধ্যে একটা শিক্ষা এই যে, কারও বুযুর্গের উপর এমন হামলা করবে না, যার দ্বারা কেউ মনে আঘাত পায়। আজকের খুতবার প্রারম্ভে যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি এ বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ইহাই। আল্লাহ্ বলেছেন,

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -

(অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে (উপাস্যরূপে) যাহাদিগকে ডাকে, তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না ; তাহা হইলে তাহারা শত্রুতা করিয়া অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে لااكراه فى الدين (ধর্মে জবরদস্তি নেই) অনুসারে বাক্‌স্বাধীনতার আদেশ স্বস্থানে ঠিক আছে। কিন্তু মুসলমানদের মুখ দ্বারা অন্যদের উপর আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে ইসলাম

নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করছে। এ ধর্মকেই তোমরা একটা স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছ? কোন লজ্জাবোধ বা ভদ্রতা বলতে কি তোমাদের কিছুই বাকী নেই? এদের প্রাচ্য বিশেষজ্ঞরা, যারা ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, তা'রা এসব কথা জানেন, তারা কুরআন বুঝেন, কেননা এদের অনেকে কুরআনের অনুবাদও করেছেন। কিন্তু এই আয়াতটাকে এরা কখনোই ইসলামের স্বপক্ষে পরিবেশন করেন না।

বস্তুতঃ, ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতা আর বাক্‌স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশী সমর্থন করে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভদ্রতার সীমান্ত রয়েছে, যার মাঝে স্বাধীনতার নাম দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। ইসলাম এই শিক্ষাকে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের শুধু আক্রমণ করতেই বারণ করছে না বরং মুসলমানদের বলছে, তোমরা অন্যদের বুযূর্গ ও মনীষীদের উপরও আক্রমণ করবে না। যদি মুসলিম দেশগুলো এই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করত তবে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে কখনো পৌঁছত না। আর এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও অন্যদের মুখের উপর বলতে পারত যে, আমরা তো তোমাদের মনীষীদেরকেও সম্মান করি। যাদেরকে সত্য বলে মানি তাদেরকে তো সম্মান করিই, উপরন্তু তাদেরকেও সম্মান করি যাদেরকে আমরা সত্য বলে মানি না। হাজার অমুসলমান মনীষী এমন আছেন যাদেরকে আহ্‌মদীরা ইসলামী

শিক্ষানুসারে সত্য বলে সম্মান প্রদর্শন করে, পক্ষান্তরে বেশীর ভাগ মুসলমান সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাদের নাম সম্মানের সাথে নেওয়াকেও সহ্য করতে পারে না। যাদেরকে তারা মিথ্যাবাদী বলে মনে করে কুরআনের এই শিক্ষার আলোকে তাদেরও সম্মান করা উচিৎ ছিল। কেননা কুরআন তো এতদূর পর্যন্ত বলছে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্যদের পর্যন্ত গালি দিবে না। বিভিন্ন মতবাদের বিশেষ বিশেষ মনীষীদের সম্মান প্রদর্শন করাটাতো এর চেয়ে ছোট ব্যাপার। কুরআন বলে মিথ্যা উপাস্যদেরকেও গালমন্দ করবে না। আরও বলে যে, তোমাদের গালমন্দের ফলে যদি তারাও পাল্টা তোমাদের মনীষীদের গালমন্দ করে সেক্ষেত্রে তোমরা আপত্তি জানাতে পারবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তাদেরকে নিজেদের কর্ম দ্বারা এ রকম কাজ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছো। দেখুন, ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর, যা ব্যক্তি সত্তার স্বাধীনতা দিচ্ছে, আবার সেই সাথে পথভ্রষ্টও হতে দিচ্ছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগত আজকে আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা হচ্ছে, 'আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতাকে কোন মূল্যে ক্ষুন্ন হতে দেব না। সালমান রুশদীকে তার লেখার কারণে আমরা এই জন্যে কিছু বলতে পারি না। কেননা, আমাদের এখানে বাক্‌স্বাধীনতা রয়েছে আর তোমাদের দেশে অসভ্যতা আছে, বোকামী রয়েছে, শত্রুতা চলে, তোমাদের ধর্ম অন্যদের ভাষা কেড়ে নেয়। তাই তোমরা বাক্‌স্বাধীনতা

কাকে বলে, কিভাবে বুঝবে ? আমাদেরকে দেখে শিখো, কেননা আমরাই এইসব গুণাবলীর পতাকাবাহী। প্রকৃতপক্ষে যে গুণাবলীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম আজ তারই একটা বিকৃতরূপের অগ্রযাত্রী হবার দাবী করছে তারা, আর নিজেদেরকে সর্বোচ্চ সভ্যতার রচনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। অথচ যদি তুলনামূলকভাবে যাচাই করা যায় তবে এটা স্পষ্ট হবে যে, তারা যে জিনিষকে নিরাপত্তা দিচ্ছে সেটা ঠিক ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। ইসলাম বলছে,—হে মুসলমানগণ ! তোমরা অন্যদের মনীষীদের, তারা যদি সম্পূর্ণ মিথ্যাও হন, তবুও গালমন্দ করবে না, এ বিষয়ে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। অপর দিকে তারা বলে, আমাদের স্বাধীনতা এই যে, অন্যদের মনীষীদের, তারা যদি কোটি কোটি মানুষের কাছে সম্মানিতও হন, তথাপি তাদেরকে গালমন্দ কর এবং অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালমন্দ কর। এটাকেই বলে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ! কেন অন্যদের কি সত্তা নেই ? তাদের কি কেবল মুখের স্বাধীনতা রয়েছে, আর কাজের স্বাধীনতা একেবারে নেই ? মুখেরই শুধু দাবী আছে ? কাজের কোন অধিকার নেই ? এটা তো একটা অসম ব্যাপার। এ কথাগুলো এদের সামনে মুসলমানদের তুলে ধরা উচিৎ।

এদের আরেকটা মুনাফেকী দেখুন ! **Blasphemy** (ঈশ্বর-নিন্দা) এর একটা আইন এদেশে চলে, কিন্তু সেটা কেবল খৃষ্ট ধর্মের পক্ষে। এর দ্বারাও ইসলাম আর খৃষ্ট মতবাদের

তারতম্য ধরা পড়ে। সেই আইনটা অলিখিত, কিন্তু যেহেতু এরা ঐতিহ্যের বাহক সে জন্যে এটা একটা প্রযোজ্য আইন আর আদালত এটা সমর্থন করে। আইনটা হচ্ছে: খৃষ্ট ধর্ম এবং যীশু খৃষ্টের বিরুদ্ধে কোন ধরণের অবমাননা, অপমানজনক কিংবা বিদ্রূপের ভাষা সহ্য করা হবে না। এই আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কিংবা বাক্‌স্বাধীনতা কোথায়। এই আইনটা এদেশে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে বর্তমানেও প্রযোজ্য কিন্তু এরা তা লুকিয়ে রেখেছে, প্রকাশ করছে না। পক্ষান্তরে ইসলাম বলে "তোমরা অন্যদের ধর্মকেও সম্মান করবে এবং সাবধান এ বিষয়ে কোন শিথিলতা দেখাবে না।" আর এই ধর্মকেই নাকি এরা বলছে সংকীর্ণতার ধর্ম, অসভ্য ও নির্বোধের ধর্ম !! এদের আইন কেবল নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধানের আইন। কিন্তু অন্যদের সম্মান দেখাতে বললে এরা বলে, এটা তো ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতার পরিপন্থী ব্যাপার। আমাকে ইংল্যাণ্ডের একটা নিমন্ত্রণে আর হল্যাণ্ডের কয়েকটা প্রেস কনফারেন্সে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তাদেরকে জানিয়েছিলাম যে, একথা অনস্বীকার্য যে বাক্‌স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু ইউরোপের রাজনীতিবিদদের নিজস্ব কর্মপন্থা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাক্‌স্বাধীনতা সীমাহীন আর লাগামহীন অবশ্যই নয়। কিছু কিছু বিষয়ে সীমা ছাড়ানোর আগেই সীমা টানতে হয়। উদাহারণ দিয়ে আমি তাদের বলেছিলাম যে, ইংল্যাণ্ড আজ সালমান রুশদীর বাক্‌

স্বাধীনতার পক্ষে এত কথা বলছে, যদি সেখানকার পার্লামেন্টে মিসেস থেচার কিংবা অন্য কোন সদস্যের সম্বন্ধে সালমান রুশদীর মত ভাষা ব্যবহার করা হয় যা সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, তাহলে সেটা কি বাক্-স্বাধীনতা বলে সহ্য করা হবে? তাকে হয় নিজের সেই শব্দগুলো প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হবে, নয়ত House থেকে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে বাক্‌স্বাধীনতার কথা কেন মনে পড়ে না? এর কারণ শুধু একটাই। আপনার বিবেক আপনাকে বলে যে, বাক্‌স্বাধীনতা সীমাহীন হতেই পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে সীমাবদ্ধ করতেই হয়। Assembly সেই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটা। আর ধর্মের ক্ষেত্র Assemblyর ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী বাক্‌সীমার অধিকার রাখে যেন কাউকে দুঃখ না দেওয়া হয়। সুতরাং এ কথাটা মিথ্যা, যখন বলা হয়ঃ 'আমরা বাক্‌স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধান করছি।' ভিতরে এরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, মুসলমানদের যন্ত্রণা দেবার ও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবার ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে। সভ্যতার কথা হলো—কাউকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু এরা নিজেরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের কষ্ট দেয়। এটাও একটা দিক যা আপনাদের সামনে থাকা দরকার।

দ্বিতীয় আর একটা দিক হচ্ছে, এই সমাজে এমন একটা অংশও আছে যারা এই ব্যাপারটাকে বুঝতেই পারে না। এ

ধরণের লোকদের জন্য মুসলমানদের বেশী বেশী করে প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিৎ ছিল, আর বোঝানো উচিৎ ছিল যে, এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা এখন প্রপাগাণ্ডার শিকারে পরিণত হয়েছে। তার একটা কারণ হল, এদেরকে বাক্‌স্বাধীনতার ভুল অর্থ বুঝানো হয়েছে। আর অপর কারণটা হচ্ছে বে-গয়রাতী (আত্মাভিমানহীনতা)। পাশ্চাত্যে এখন দু'টি রোগ ছেয়ে গেছে যার কবলে সমগ্র জাতি নিপতিত। একটা হচ্ছে অশ্লীলতা আর অন্যটা হচ্ছে ধর্ম থেকে দূরত্ব। দেখা যায় এখানে কখনো কখনো ঈসা (আঃ) সম্বন্ধেও এমন কথা বলা হয় যা প্রকৃত-পক্ষে কোন আত্মমর্যাদাশীল খৃষ্টানেরও সহ্য করার কথা নয়। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধই যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তো আর করার কিছু থাকে না। (কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর অবমাননায় মুসলমানরা কষ্ট পায়। যখন খৃষ্টান দেশে যীশুকে অপমানিত করা হয় তখন মুসলমান হিসেবে আহ্‌মদীরা খুব কষ্ট বোধ করে।) অপরদিকে যৌনতা এদের উপর এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, এটা তাদের নিকট একটা সামান্য ব্যাপার। নাটক উপন্যাসের মধ্যে যৌন ঘটনার অবতারণা যেন একটা সাধারণ ব্যাপার। যে সমাজে যৌনতার ছড়াছড়ি আর যাদের কাছে পবিত্রতার কোন ধারণাই নেই তাদের কাছে এমন একটা গল্প যার মধ্যে পবিত্র ব্যক্তিবর্গকে যৌনতার শিকারে পরিণত করা হয়েছে নিছক একটা আকর্ষণীয় উপন্যাস মাত্র। এদেরকে বোঝানো প্রয়োজন যে, মুসলমানদের চিন্তাবোধ তোমাদের

থেকে ভিন্ন। আমাদের যদি বুঝাতে চাও তবে তোমরা তোমাদের খৃষ্ট ধর্মের প্রাথমিক শতাব্দীর ষ্টাডি কর। তোমরা সেই যামানাকে অন্ধকার আর নির্বুদ্ধিতার শতাব্দী বলে থাক, আর আমরা জানি যে, সে সময় তোমাদের মধ্যে সেই আলো ও আত্মমর্যাদাবোধ বিদ্যমান ছিল যা এখন নিভে গেছে। একভাবে তোমরা অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছ। কিন্তু অন্যভাবে তোমরা আলো থেকে আঁধারে প্রবেশ করেছ। সে যুগে ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে, এখন যা রেডিও টিভি আর কাগজে বলা হয়, তার হাজার ভাগের এক ভাগও সহ্য করা হত না। এখন তারা বলে, ঈসা (আঃ), যিনি ঈশ্বর-পুত্র ছিলেন — তাঁর বিরুদ্ধে যখন আমরা কথা বলার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি, তখন এমন ব্যক্তি যাকে আমরা নবীও মনে করি না, তার বিরুদ্ধে কথা বললে মুসলমানরা আপত্তি করার কে? তাদেরকে এই ধরণের পার্থক্যগুলি বোঝাতে হবে; ভদ্রতা ও শালীনতার উদ্ধৃতিও দিতে হবে। বলতে হবে, ইসলাম একটা বিরাট শক্তি এর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করা উচিত। পৃথিবীতে শান্তি পুনঃ স্থাপনের জন্য কাউকে কষ্ট দিলে চলবে না।

এই সমস্ত ঝামেলার ব্যাপারটা বোঝানোর কাজ একদমই করা হয় নি। এক পর্যায়ে হল্যাণ্ডের প্রেস যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন আমি তাদের ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আজকাল বৃটিশ প্রেস ইসলামের স্বপক্ষে কোন ভাল কথা জানানো হলে তা প্রকাশই করে না, পক্ষান্তরে

হল্যাণ্ডের প্রেস একদম স্বাধীন। তারা রেডিও এবং সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে আমার বক্তব্যটা হুবহু প্রকাশ করে — আমরা কেন প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমাদের আপত্তিটা কি, আর আমাদের কি করা উচিৎ। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি : তোমাদের বাক্‌স্বাধীনতা কিংবা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, তবে কেন তোমাদের নেতারা এই অসভ্যতা আর নোংড়ামীর প্রতিবাদ জানালেন না? তোমাদের মুখে এ বিষয়ে তালা লাগল কেন? তোমাদের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা, তোমাদের রাজনীতিবিদরা এই জঘন্য মানুষটার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলল না কেন? তারা কেন বোঝাল না যে, এটা ভদ্রতা-বিরোধী কাজ? এ সব বিষয়ে মুসলমানদের মন অত্যন্ত সচেতন, এমন ব্যক্তিদের অসম্মান করা ভুল যাদের জন্য কোটি কোটি মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করার দাবী করে, আর লাখ লাখ মানুষ সত্যি সত্যিই তাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এটা আগুন নিয়ে খেলা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। তোমাদের ও তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রয়েছে। ভদ্রতার জন্য না করলেও নিজেদের স্বার্থেই তোমরা যদি রুশদীর এই বই এর বিরুদ্ধাচরণ করতে আর তাদেরকে জানাতে যে, আমাদের আইন এই বইটাকে ব্যাণ্ড করার পথে অন্তরায় বিশেষ। তাহাতেও ইসলামী বিশ্বের প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক-ভাবে সঙ্গত হত। খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে রুশদীর বই এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা শুনার ফলে তারা কিছুটা অবশ্যই শান্তি পেত। এ

ক্ষেত্রে তো তারা বাক্‌স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেন নি। বরং তা নোংড়ামীকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই তারতম্য দেখা যাচ্ছে, বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া এত ক্ষতি করেছে যা একা এই বইটা কখনোই করতে পারত না। বই জ্বালানো হয়েছে, হৈ চৈ করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে। যার ফলে, ইসলাম তলোয়ারের যুদ্ধের শিক্ষা দেয়, অন্যদের হত্যা করতে উদ্যত হয় ইত্যাদি অদ্ভুত ধারণা খৃষ্টানরা নিজেদের মনে পোষণ করা আরম্ভ করেছে। ইংল্যাণ্ডের খৃষ্টানদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাদের এই ধারণা জন্মেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান অমুসলিমদের শিরোচ্ছেদ করতে প্রস্তুত। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা মোট ১০ লক্ষ। দুঃখের বিষয় এই যে, এদের উত্তেজনা যত দ্রুত সৃষ্টি হয় তত তাড়াতাড়ি শেষও হয়ে যায়, কেবল স্থায়ী ঘৃণা বাকী থাকে। এতে ইসলামের কোন লাভ হয়নি বরং ইসলামের ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী। বইটা তো সাংঘাতিক প্রোপাগাণ্ডা সত্বেও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, বেশ ক'টি দেশ নিজে নিজেই এটাকে ছাপাতে অস্বীকার করেছে। প্রতিবাদের পূর্বেই ভারত এ বইটা ছাপাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, জাপানও প্রকাশ করতে রাজী হয়নি। এমনি অন্যান্য কয়েকটি দেশও স্বাভাবিক কারণে এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সামান্য ক'জন লোক হয়ত এই নোংড়া বইটি পড়ত। এ বইটা এতই জঘন্য ভাষায় রচিত যে ভদ্র লোক এটার দিকে মনো-

যোগই দিত না। কিন্তু এখন এ বইটা এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, কোটি কোটি ইউরোপীয় মানুষ এটাকে কেনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে। একবার যখন মিসেস থেচার **Spy Catcher** পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তাঁর সমালোচকরা তাঁকে বলেছিলেন যে, তুমি তো বইটাকে গোপন করতে চেয়েছিলে কিন্তু তোমার অভিযানটাই এটাকে প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। অভিযান একটা প্রণালীতে চালানো হয় কিন্তু তার কুফল অভিযান পরিচালনাকারীর উপরই বর্তায় আর শত্রুর লাভ হয়। এখন আমেরিকার টিভি ও রেডিওতে সেই নোংড়া বই এর উদ্ধৃতি পড়ে শোনানো হচ্ছে যেটা মনোকষ্টের প্রধান কারণ ছিল। এখন তাদের বই কেনার প্রয়োজন নেই বরং বাসায় বসে বসেই কোটি কোটি মানুষ এই সব কথা জানতে পারছে। এটাতো মুসলমানরা চায় নি। সেজন্য মানুষের উচিত বুদ্ধির সাথে কাজ করা। দুঃখের বিষয় মুসলমানদের তো সম্প্রতি কোন সঠিক নেতৃত্ব নেই, আর মৌলভী তো জানেই না কি করা উচিৎ নয়। এ যুগের মুসলমানদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ মোল্লা যার পৃথিবীর অবস্থা পরিস্থিতি কিংবা রাজনীতির কোন ধারণাই নেই। যে কেবল সাময়িকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক আন্দোলনে অংশ নেয় আর অশান্তি আর রক্তপাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। এরই ফলশ্রুতিতে যে প্রতিক্রিয়ার এখানে সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও হবে বলে

আমি ভয় করি সেটা হচ্ছে **Racialism** যা প্রকট আকার ধারণ করবে আর অনেক দীর্ঘকাল যাবৎ ষড়যন্ত্রের আর এক ঘৃণার জাল বুনতে থাকবে। ইসলাম সমাজে যে মর্যাদা পেতে সক্ষম হয়েছিল সেখান থেকে এখন তা অনেক নীচে গিয়ে নেমেছে। এর সবটাই বিনা কারণে। যদি এমন কোন আন্দোলন করা হত যার ফলশ্রুতিতে আমরা তো অপমানিত হতাম, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হত, তবে আমি সর্বপ্রথম তা সমর্থন করতাম, আজও করব এবং চিরকাল এর পক্ষে থাকব। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির স্থলে যদি আপনি তার আরও বেশী অবমাননার কারণ হয়ে যান, তদুপরি জাতীয় দুর্যোগও ডেকে আনেন — তাহলে এটা কোন্ ইসলামের ফলে হলো, এটা কোন্ ইসলাম হলো ??

আরেকটা বিষয়, যেহেতু ষড়যন্ত্রকারী বিশেষভাবে ইরানকে লক্ষ্য করে এ কাজটা করিয়েছে যেন ইরান প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে — যেহেতু ইরান যখন প্রতিবাদ জানাল তখন আরবের প্রাণ কেন্দ্র হেজায অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা এ ব্যাপারে একদম নিশ্চুপ থাকলো। ইরান বলেছে বলে তারা বলবে না। ইরানের ফত্ওয়ার কারণে মিশর তার বিপরীত ফত্ওয়া দিয়েছে বলেছে — **Blasphemy**র কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে না। দেখুন, কত বড় মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বলা হয়, কোন ব্যক্তি যদি ইঙ্গিতেও মুহাম্মদ (সাঃ)-

এর সম্মানের অবমাননা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, আর অন্যদিকে যেহেতু খোমেনী সাহেব ফতওয়া দিয়েছেন, তাই Balsphemyর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হবে না। কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা, অন্যদের সামনেও ধর্ম গেল, নিজেদের কাছেও গেল? সেখানেও ধর্মের আড়ালে রাজনীতি আর ভেজাল এখানেও তাই।

পাকিস্তানের এক প্রসিদ্ধ আলেম মৌলানা মোহাম্মদ তোফায়েল সাহেবের কাজ দেখুন, যিনি আফগান সমস্যার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন জিয়ার আমলে। একদিকে রুশদী ক্ষমা চাইল আর অমনি তিনি বললেন "যাও, তোমাকে ক্ষমা করলাম।" একজন আহ্‌মদী যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে ঘোষণা দেয় لا اله الا الله محمد رسول الله তখন তাঁকে তোমরা واجب القتل, হত্যার যোগ্য বল, কোন ক্রমেই তাকে ক্ষমা করতে চাও না। কিন্তু নির্লজ্জতার চূড়ান্ত যে, এক খবিস ব্যক্তি, যে হুযুর (সাঃ) এবং অন্যান্য বুযুর্গদের উপর নিতান্ত অশ্লীল অপবাদ দিয়েছে যা পড়ে একজন মুসলমানের মাথায় রক্ত উঠে যায় এবং সে টিভি রেডিওতে বলে যে, সাধ্য থাকলে এর চেয়েও জঘন্য বই আমি লিখতাম।' সে কখনো নিজের বই-এর বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে একটা

উক্তিও করে না, সেই লোকটা যখন লোক দেখানোর জন্য ক্ষমা চাইল, চট করে তোমরা তাকে ক্ষমা করে দিলে! অদ্ভুত তোমাদের প্রতিশোধের ধরণ! যারা হুযুর (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর তোমাদের দৃষ্টিতে তারা হত্যার যোগ্য। অথচ একটা অশ্লীল ও নোংড়া সীমালঙ্ঘনকারী ও হামলাকারী যখন লোক দেখানো মিথ্যা ক্ষমা চাইল তোমরা তখন তাকে ক্ষমা করে দিলে যেন তোমরা খোদা বনে বসেছ। ওকে ক্ষমা করা কখনই তোমাদের এখতিয়ারের বিষয় নয়। খোদাতা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য যে গায়রত (আত্মাভিমান) রাখেন তারই কারণে তিনি কখনো এরকম ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারেন না যে এতটা নির্লজ্জ আর অশ্লীলভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র মানুষটির উপর আক্রমণ করেছে। তাকে ক্ষমা করার তোমরা কে?

ইসলাম এ বিষয়ে হত্যার শাস্তি আরোপ করে না। আর এটাই আহ্‌মদীয়াতের শিক্ষা। তোমরাই আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে আর এই শিক্ষার বিরুদ্ধে সব সময় আন্দোলন করে এসেছ। আবার আজকে যখন খোমেনী হত্যার ফত্‌ওয়া দিয়েছেন তোমরা নিজেদের ফত্‌ওয়া বদলে বলছ যে, Blasphemyর কারণে কাউকে হত্যা করা যেতে পারে না। এটাই

হল তোমাদের তাক্ওয়া, তোমাদের ধর্ম আর তোমাদের রাজনীতি — এটাকেই তোমরা ইসলাম বল ? পৃথিবীতে কেবল মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ইসলাম প্রসার লাভ করবে, সেই ইসলাম যার উপর আহ্মদীরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকবে। যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তোমরা নিজেরাই শত্রুদের হাতে সেই সব অস্ত্র তুলে দিয়েছ যা দ্বারা তোমাদের উপর এখন তারা আক্রমণ চালাচ্ছে, যার সদুত্তর দেওয়ার, প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের কাছে ক্ষমতাও নেই, সুযোগও নেই।

সুতরাং আজ আমি আহ্মদীয়া জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করছি : বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেন এমন স্থায়ী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার প্রভাব ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপরও পড়ে। আগামী শতাব্দী আর তার পরের শতাব্দী আবার তার পরের শতাব্দী পর্যন্ত সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ কর। আজকে এটা কোন একটা বিশেষ শতাব্দীর প্রশ্ন নয়। সমস্ত যুগই মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর দাস। প্রথম যুগেও তিনিই বাদশাহ ছিলেন আর আগামীতেও তিনিই থাকবেন। তাই চিরকালের জন্য জামা'ত আহ্মদীয়াকে এ ধরণের জঘন্য প্রচেষ্টাকে নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সুতরাং বিশেষভাবে আমি জামা'তের সেই প্রজন্ম (Generation) কে সম্বোধন করছি যারা এ সব দেশে জন্ম নিয়েছেন যেখানে ইসলামের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

যদিও আমরা এ সমস্ত আক্রমণের উত্তর দেবার বিষয়বস্তুকে বুঝি কিন্তু ভাষার ধরণটা সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। কেননা যারা পাক-ভারত উপ মহাদেশে জন্ম নিয়েছে তাদের মাঝে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোক ইংরেজীর সাথে সেভাবে জড়িত ও পরিচিত যেভাবে একজন ইংরেজ তার ভাষাকে জানে। কিংবা ভাল স্কুলে পড়ে ধর্ম না শিখে থাকলেও ইংরেজী ভাষাকে অন্ততঃপক্ষে রপ্ত করেছে আর এদের পসন্দসই সংলাপে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তাই নতুন বংশধরদের স্থানীয় ভাষায় পারদর্শী করে তুলুন আর নতুন বংশধরদের মাঝ থেকে বেশী বেশী করে লেখক প্রস্তুত করুন। আর এই নিয়্যত করুন যেন তারা লেখার পারদর্শিতার সাথে সাথে ইসলামের পড়া-শুনাও বেশ বেশী করে যেন এদের রচনার পারদর্শিতা ইসলামের এবং মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর নিরাপত্তা বিধানে কাজে লাগে।

সুতরাং এমন আহ্‌মদীরা যারা আমেরিকা, আফ্রিকায়, ইউরোপে, চীনে কিংবা জাপানে বা যেখানেই থাকুন না কেন যাদের শিক্ষা বা প্রস্তুতি এমনভাবে হয়েছে যার কারণে তাদেরকে সেখানকার স্থানীয় ভাষাভাষী বলা চলে তাদের সবাইকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিরক্ষায় উৎসর্গ হয়ে যাওয়া উচিৎ। আর তার জন্য সাহিত্য ও কথার পারদর্শিতা অর্জন করা উচিৎ যেন শত্রুদের পন্থায় তাদের আক্রমণের পাল্টা উত্তর দেয়া যেতে পারে যেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে। এই যুদ্ধ দু' একদিনের যুদ্ধ নয়। এ

ঘটনাকে এই লোকেরা ভুলে যাবেন এবং ইতিহাস হয়ে যাবে। পরে আবার আরেকটা পাজীর আক্রমণ ঘটবে সেও গত হয়ে যাবে আবার আরেকজন উঠবে আর আক্রমণ করবে তাই আহ্‌মদীয়াতের উচিৎ ইহা যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সামনে বুক পেতে এগিয়ে যায় যেভাবে হযরত তালহা (রাঃ) তীর থেকে হুযুর (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল বাঁচানোর জন্যে নিজের হাত পেতে দিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর হাতটা পঙ্গু ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। সেভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটা তীর নিজের বক্ষেঃ গ্রহণ করুন, এটাই ইসলামকে রক্ষা করার উপায়। এটাই ইসলামের রূপ আর যে সমস্ত বিষয়াদি এই বইতে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো যাচাই করে জ্ঞানী ও গবেষকগণ বেশী বেশী প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে উত্তর প্রকাশ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা সজীব রয়েছে তাড়াতাড়ি প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন প্রকাশিত হওয়া উচিৎ।

সৌভাগ্যবশতঃ একটা ইংরেজ কোম্পানী আমার বই 'ধর্মের নামে রক্তপাত' কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর প্রকাশ করতে যাচ্ছে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আমার দ্বারাই হয়েছে, এজন্য কেউ যেন ভুল না বুঝে বসে। আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় এই নগণ্য সেবার সুযোগ আমি পেয়েছি। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ ইং তারিখের জুমুআর খুৎবার বঙ্গানুবাদ)।

গত জুমুআর খুতবায় আমি সালমান রুশদীর শয়তানী বই সম্বন্ধে আমার কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। তবে

এখনো বিষয়টা সম্পূর্ণ হয় নি। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় রয়েছে যেগুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে এখন সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন। এরা মানুষের সমস্ত মনোযোগ, সালমান রুশদীর বই এর নোংরামী থেকে সরিয়ে এইসব মৌলিক প্রশ্নের দিকে আকৃষ্ট করাচ্ছে। ভাবটা এমন যেন মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মাঝে বা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মূল দ্বন্দ্বই হচ্ছে – মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কি নাই।

পবিত্র সত্তার অধিকারী ব্যক্তিগণের অবমাননা কিংবা স্বয়ং খোদাতা'লার পবিত্রতার উপর আক্রমণের ব্যাপারে কুরআন শরীফে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান। এই সময়ে মুসলমানদের উচিত ছিল সমস্ত পৃথিবীর সামনে কুরআনের এই শিক্ষাকে খুব ভালভাবে তুলে ধরা। জগদ্বাসীকে বলা প্রয়োজন ছিল, এই ধরণের পরিস্থিতিতে কুরআন শরীফ আমাদেরকে কি করতে বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কাজটা না করে যে ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে আর যেসব ফত্‌ওয়া প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হয়েছে বেশী। এতে করে শত্রুরা ইসলামের কল্পিত রূপকে আরও বীভৎস আকারে জগতের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। তাই আজকে আমি এ প্রসঙ্গে জামা'তের এবং

এই জামা'তের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর সামনে পবিত্র মহাপুরুষ কিংবা খোদাতা'লার উপর জঘন্য আক্রমণের মোকাবেলায় কুরআন করীম আমাদেরকে কি শিখিয়েছে, আর কি করতে বলেছে, সেটা তুলে ধরতে চাই।

কুরআন করীমের কয়েকটা আয়াত এ বিষয়ের জন্য আমি বেছে নিয়েছি। একটা হল :

ينذر الذين قالو اتخذ الله ولدا مالهم به من علم
ولالآبائهم ......يؤمنوا بهذا الحديث اسفا (كهف ع ١)

সূরা কাহাফের ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বর্ণনা করছেন যে, খৃষ্টানরা খোদাতা'লার পবিত্রতার উপর সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন এক পুত্র সন্তান আরোপ করেছে যার জন্ম একজন নারীর গর্ভে। যদিও মূর্তি পূজারী কোন কোন ধর্মে একই ধরণের বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র পুত্রদেরকে মহিলার গর্ভজাত আখ্যায়িত করে না। الا ماشاء الله আর যদি এরকম বলাও হত, তথাপি এখন সেটা প্রাচীন ইতিহাসের অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান মতবাদের এই বিশ্বাস যা পৃথিবীতে প্রসারিত এবং প্রভাব বিস্তারকারী হবারও কথা ছিল, তাকে অর্থাৎ সেই অবমাননাটাকে কুরআন শরীফ দৃঢ়-ভাবে খণ্ডন করেছে। কুরআন বলে كبرت كلمة ...افواههم (كهف)

অর্থাৎ তোমরা চিন্তাও করতে পার না যে এরা কত

জঘন্য কথা বলছে। এদের আস্পর্ধা কোন সাধারণ আস্পর্ধা নয়। এতে, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার দিকে দৈহিক সঙ্গম আরোপ করা হচ্ছে। একজন মহিলার গর্ভ থেকে পুত্র সন্তানের জন্ম কেবল অনুরূপ ধারণারই সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ان يقولون الا كذبا অর্থাৎ এরা কেবল মিথ্যাই বলছে। কিন্তু এখানে তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়ার কথার উল্লেখ নেই। সব চেয়ে বড় পবিত্র সত্তা তো প্রকৃতপক্ষে কেবল আল্লাহ্‌তা'লার! তাঁর সম্বন্ধে চরম অবমাননাকর উক্তির কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা সত্বেও শাস্তি প্রয়োগ না করা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, খোদাতা'লা নিজ হিক্‌মতে কোন মানুষকে খোদাতা'লার অবমাননার অপরাধে অপর কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেন নি।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ? এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করার মাধ্যমে সেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, فلعلك ..... اسفا

অর্থাৎ যদি এরা তোমার উপদেশ না শুনে, তোমার কথা না বুঝে এবং ঈমান না আনে তবে কি তুমি তাদের এই চরম অবমাননাকর আস্পর্ধার কারণে দুঃখে নিজেকে শেষ করে দিবে? সুতরাং এখানে যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় আর কিছুই হতে পারে না। আর মনের কষ্টের দরুন যে সৎকর্ম করা হয়, সেই

সৎকর্ম ইসলামের উপর আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করে থাকে। মনের কষ্টের সাথে, সৎকর্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এই মহান জেহাদ, যার সূচনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) করেছিলেন, এই যাতনার সাথে এর একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

অবমাননার দ্বিতীয় আর একটা উদাহরণ কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে যেটা খৃষ্টানদের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এই অবমাননা খোদাতা'লার নয় বরং আক্রমণটা স্বয়ং খৃষ্টানদেরই উপর করা হয়েছে। অদ্ভুত কুরআনের মহিমা! দু'টো উদাহরণই খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম উদাহরণে খৃষ্টান মতবাদ আল্লাহ্-তা'লার পবিত্রতার উপরে আক্রমণ চালিয়েছে আর দ্বিতীয় উদাহরণে খৃষ্ট ধর্মের শত্রুরা স্বয়ং হযরত মসীহ্ এবং হযরত মরিয়মের পবিত্রতার উপর আঘাত হেনেছে। ঘটনা একটাই যার থেকে এই দু'টো গল্প বানানো হয়েছে। এটাও ভুল আর ওটাও ভুল। আল্লাহ্তা'লার কোন পুত্র সন্তান থাকার ধারণাটাও ভুল আর হযরত মসীহ্র (নাউযুবিল্লাহ্) অবৈধ সন্তান হওয়ার ধারণাটাও ভুল। দ্বিতীয় অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, وبكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما -

অর্থাৎ খোদাতা'লা যে সব কারণে ইহুদীদের উপর লা'নত করেছেন তার একটা বড় কারণ হচ্ছে, তারা হযরত মরিয়মের উপর বড় ধরণের অপবাদ দিয়েছিল। এই অপবাদের মাধ্যমে হযরত মরিয়মের উপর বড়ই জঘন্য হামলা করা হয়েছে।

তিনি হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মা হবার কারণে খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আর একই সাথে তাদের তথাকথিত খোদার পুত্রের উপরও আক্রমণ করা হয়েছে যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন পবিত্র সত্তা ও খোদার সত্য রসূল। কুরআন করীমের কথা কত মহান! এটা বলা হয় নাই যে, যেহেতু খৃষ্টানরা খোদাতা'লার সত্তার উপর আক্রমণ করেছে সেহেতু তাদের উপর হামলা কর, তাদেরকে কষ্ট দাও বরং কুরআন খৃষ্টানদের মনে আঘাত দানকারীদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, একদল অত্যাচারী আল্লাহ্-তা'লার সত্তার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আবার আরেক দল যালেম আল্লাহ্তা'লার উপর আক্রমণকারীদের উপর আক্রমণ করছে। এ ক্ষেত্রে দু'টো হামলাই অবৈধ আর দু'টোই অপবিত্র। যদিও এটা সত্যের একটা বিশেষ দায়িত্ব যে, যেখানে মিথ্যা এবং অসত্য দেখবে, সেখানেই তার প্রতিবাদে জিহাদ করবে। এটা কুরআনেরই শিক্ষা। তবু এই দু'টোর স্থলে কোথাও বলা নাই যে, যেহেতু খৃষ্টানরা খোদার মর্যাদা হানী করেছে, সেহেতু তোমরা তলোয়ার বের কর এবং তাদেরকে আক্রমণ কর আর তাদের শিরোচ্ছেদ করে দাও। কিংবা কোথাও নেই যে যেহেতু ইহুদীরা খৃষ্টানদের এবং তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) বুযুর্গদের উপর জঘন্য আক্রমণ করেছে তাই উঠো আর তাদেরকে আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দাও।

তৃতীয় আরেক স্থলে আল্লাহ্তা'লা একই বিষয়ের সাধারণ

একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই সাথে একজন মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত তারও উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে দু'টো আয়াত একই বিষয়ে আলোকপাত করছে। একটা আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার ১৪১ আয়াত যাতে আল্লাহ্ বলেছেন :

وقد نزل عليكم فى الكتب ان اذا سمعتم ايت الله يكفر بها و يستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره - انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكفرين فى جهنم جميعا —

(তরজমা : এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐ গুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, সেই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন)

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে, খোদাতা'লা তোমাদের জন্য এই কিতাবে আদেশ প্রদান করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্তা'লার আয়াতসমূহের অস্বীকার শুনতে পাও বা সেগুলি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ হতে দেখ—যা এখন সালমান রুশদীর বই এর ব্যাপারে হুবহু ঘটেছে—তখন তোমরা কি করবে? তোমরা কি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের ফত্ওয়া দিবে? কিংবা নিষ্পাপ এবং

অজ্ঞ মুসলমানদের পথে নামিয়ে তাদেরকে গুলি দিয়ে ঝাঁঝ্‌রা করাবে? কক্ষনো না। আল্লাহ্ বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের জন্য কেবল একটাই প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত করা হয়েছে আর সেটা হল فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره - অর্থাৎ তাদের সাথে বসবে না (মেলা-মেশা রাখবে না)। কিন্তু, তবুও চিরকালের জন্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবে না। যদি তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের বজ্জাতী ও কষ্টদায়ক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়, তবে পুনরায় তাদের সঙ্গে বসতে পার। আর এই বসতে নিষেধ করার আদেশটা নিজ ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আদেশ। বসার দু'টো কুফল বেরুতে পারে। কখনো কখনো দুর্বল চিত্তের অধিকারীরা তাদের বুযুর্গদের উপর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সমস্ত নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে আক্রমণকারীদের হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হয়। আর পৃথিবীতে সর্বত্র এভাবে অশান্তি ছড়াতে পারে। দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে এই যে, মানুষের নিজের আত্মাভিমানটাও ধ্বংস হয়ে অবশেষে ঈমানটাই নষ্ট হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু'দিকেই বিপদ। সুতরাং দেখুন কত চমৎকার আর কত সভ্য একটা শিক্ষা! যাতে কেমন সুন্দরভাবে মানুষের আবেগকে, আর সেই আবেগ থেকে অন্যদেরকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যখন তোমরা এ ধরণের অপমানজনক কথা বার্তা শুনবে সেখানে আর না বসে উঠে পড়। আর তাদের শাস্তির সমস্ত দায়িত্ব

আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا - নিশ্চয়ই মোনাফেক এবং অবিশ্বাসীদের সবাইকে আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

আরেক স্থলে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

و اذا رايت الذين يخوضون فى ايا تنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ٥ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون - (انعام ٦٩)

যখন তোমরা এমন লোকদের দেখ যারা আমাদের আয়াতসমূহের ব্যাপারে লাগামহীন, ভিত্তিহীন অবান্তর কথা বলে فاعرض عنهم তখন তোমরা তলোয়ার নিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়োও না বরং তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর حتى يخوضوا فى حديث غيره এখানেও আবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ চিরকালের সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা স্থায়ী বয়কটের আদেশ দেয়া হয় নি। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত দুষ্ট ব্যক্তি তার এই শয়তানীতে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন কর। কিন্তু তারা যদি অন্যান্য বিষয়ে আজে বাজে কথাবার্তা বলে, তবে তাদেরকে বলতে দাও, তারা এমনটা বলেই থাকে। এই ব্যাপারের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে মনে রাখবে, ধর্মীয় বিষয়ে গায়রত (আত্মাভিমান) প্রদর্শন করা তোমাদের কর্তব্য। আর গায়র-

তের দাবী হচ্ছে তোমরা এমন ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাবে। وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين আর যদি শয়তান তোমাদের ভুলিয়ে দেয় তবে এই উপদেশের পর তোমরা তাদের সাথে আর বসবে না। এখানে ينسينك الشيطان এর অর্থ কি? এস্থলে এর অর্থ হচ্ছে, এমন সমস্ত লোক যারা দুর্বল চিত্তের অধিকারী, যারা এই সব বাজে কথা শুনে চটে যায় এবং প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে, এ ধরণের লোকদের জন্য পরবর্তী সময়েও এমন লোকদের কাছে বসার অনুমতি নেই। কেননা এতে ধীরে ধীরে তাদের ঈমানই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইসলাম যুক্তি প্রমাণ থেকে পালানোর শিক্ষা দেয়নি বরং ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং জঘন্য কথাবার্তা থেকে পৃথক হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। আর এদের সাথে শক্ত ব্যবহার কিংবা এদের মুখ বন্ধ করার ক্ষেত্রে কুরআনের পরবর্তী আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء যারা আল্লাহ্‌তা'লার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেন, তাদের কাছে এসব লাগামহীন ও বাজে লোকদের কোন হিসাব নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের কোন কোন দোষ বা দায়িত্ব একেবারেই নেই। সুতরাং যখন দায়িত্ব তোমাদের নয়, আর হিসাব তোমাদের কাছে চাওয়া হবে না, তবে তোমরা আইনকে নিজের হাতে কেন তুলে নিচ্ছে? ولكن ذكرى হ্যাঁ, একটা কাজ তোমাদের রয়েছে আর সেটা হচ্ছে তোমরা তাদের উপদেশ দাও এবং

বোঝানোর মাধ্যমে যা করা যায়, কর। لعلهم يتقون হতে পারে, অসম্ভব কিছুই না, তারা তাক্ওয়া অবলম্বনও করতে পারে। সুতরাং যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ আছে বলে তোমরা মনে কর তাদের সম্বন্ধে এটা কিভাবে বলা চলে যে, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে !!

কেবল উল্লেখিত ৩/৪টি আয়াতেই নয় বরং কুরআন করীমের যে স্থলেই এই বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে কোথাও খোদার কিংবা তাঁর পবিত্র বান্দার অবমাননা-কারীদের শাস্তি দেয়ার অধিকার মানুষকে দান করা হয় নি। বরং শাস্তি দেয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রেখেছেন। বার বার এই বিষয়টা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

খোদাতা'লার গৃহীত এই পদ্ধতি একটা বড় হিকমতের বাহক। এর উপর বিশ্ব-শান্তি নির্ভরশীল আর মানব সমাজকে অশান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য এই শিক্ষা আবশ্যক। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মর্যাদা ও পবিত্রতার মাপকাটি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন ধরণের। আর প্রত্যেক জাতি নিজেদের মনে, নিজস্ব ব্যক্তিত্বদেরকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। আবার তাঁদের অবমাননা কিংবা মানহানীর ধারণাও বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতার কারণে লোকেরা বলে যে, তোমরা যদি আমাদের

বুযুর্গদের নামও মুখে আন এটাও তাঁদের অবমাননা! আল্লাহ্-তা'লা যদি প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব চিন্তানুসারে বুযুর্গদের অবমাননার শাস্তি দান করার অনুমতি দিতেন তবে সারা পৃথিবীতে অরাজকতা ছেয়ে যেত। সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম অন্য ধর্মের উপর হামলাকারী প্রতীয়মান হত। আবার কয়েকটা এমন আবেগপ্রবণ ধর্মও আছে যে সব ধর্মের অনুগামীরা তাদের উপর আক্রমণ না করা সত্বেও আক্রমণ করা হয়েছে বলে মনে করে। তাই মানব সমাজকে অশান্তি ও অরাজকতা থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্তা'লা এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা দান করেছেন। আর সার্বজনীন এই শিক্ষা আর কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। কেননা, অন্য কোন ধর্ম আন্তর্জাতিক নয়, আর ছিলও না। কেবলমাত্র সেই ধর্মকে এই সর্বোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, যা সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরিত।

সুতরাং কুরআনের এ সমস্ত শিক্ষা বেশী বেশী করে পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্য ও খৃষ্টান জগতের সামনে তুলে ধরা উচিৎ। তাদেরকে বলা উচিৎঃ তোমরা আমাদেরকে কি সভ্যতা শেখাবে? তোমরা তো কেবল ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করছ। আর তাও গোটা ইসলামের শিক্ষাকে তোমরা রপ্ত করনি বরং তার কিয়দংশ গ্রহণ করেছ মাত্র! যাকে আজ তোমরা সভ্য যুগের সভ্যতা হিসেবে গ্রহণ করেছ, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তার মাঝে অনেক ত্রুটি রয়েছে। তোমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তোমরা যা কিছু উত্তম বর্ণনা কর তা পূর্ব থেকেই ইসলামে বিদ্য-

মান। আর যা কিছু তোমরা পাওনি তাও ইসলামের কাছে আছে। আর সভ্যতার নামে তোমরা যে শিক্ষা পরিবেশন করেছ সেগুলির খুঁতও ইসলাম চিহ্নিত করেছে।

সুতরাং মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই যে, কুরআন করীম দু'টো ক্ষেত্রকে পৃথক করেছে। শারীরিক ক্ষেত্র আলাদা এবং কথার ক্ষেত্র আলাদা। যে সমস্ত আক্রমণ শারীরিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ইসলাম সেগুলির প্রত্যুত্তর শারীরিকভাবে দেয়ার অনুমতি দেয়। আর কথার আক্রমণের পাল্টা জবাব কথারই মাধ্যমে দেয়ার অনুমতি প্রদান করে। এটাও শিক্ষা রয়েছে যে, যদি কেউ সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিকে গালমন্দ করে, (এক্ষেত্রে খোদা কিংবা বুযুর্গদের প্রশ্ন নেই) আর সেই গাল-মন্দ সহ্য করতে না পেরে যদি কেউ তেমনি কোন অপসন্দীয় কথা বলে ফেলে তবে ইনসাফ আর অতুলনীয় শিক্ষার আলোকে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিরুপায় ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার অস্ত্র বের করার বা হত্যা করার বা শারীরিক শাস্তি দেয়ার কোন অধিকার নেই। সুতরাং এগুলি দু'টো পৃথক বৃত্ত। যেখানে আক্রমণ তলোয়ার দিয়ে করা হয়, সেস্থলে তলোয়ার দ্বারা সেটাকে প্রতিহত করা কেবল বৈধই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফরযও হয়ে যায়। আর যদি কথা বা কলম দ্বারা আঘাত করা হয়ে থাকে তবে কথা বা কলম দিয়ে উত্তর দেয়া কেবল বৈধই নয় বরং আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, পাশ্চাত্য জগতকে ইসলামের বিকৃত চিত্র পরিবেশন করার সুযোগ না দিয়ে যদি কথার মাধ্যমে এই আক্রমণের উত্তর দেয়া হত, আর কুরআন প্রদত্ত হাতিয়ার উত্তমভাবে ব্যবহার করে এই হামলাকে প্রতিহত করা হত, তবে তাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া যেতো। এ যুদ্ধে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ অস্ত্রের যুদ্ধেও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কথা ও কলমের যুদ্ধে সেই বুদ্ধিমত্তার আরও বেশী দরকার। আমাদের খোঁজ নেয়া উচিৎ ছিল যে, আজ পাশ্চাত্যের কাছে কোন্ অস্ত্রটা আছে যদ্বারা সে আজ ইসলামের উপর হামলা করছে? আমরা সেই একই অস্ত্র দিয়ে কেন পাল্টা আক্রমণ করি না? হ্যাঁ, তবে আমরা কারও অবমাননা করতে পারি না। কেননা, যারা তাদের কাছে সম্মানিত তারা আমাদের নিকটেও সম্মানিত। এ কারণে এই যুদ্ধ অনেকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর একপক্ষের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের উপর আঘাত হানে তখন لعلك باخع نفسك (অর্থাৎ দুঃখে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলা) এর শিক্ষার উপর আমরা আমল করতে পারব ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে পাল্টা অনুরূপ আক্রমণের কোন সুযোগ থাকে না। কেননা হযরত মরিয়ম তাদের ন্যায় আমাদের নিকটেও সম্মানিত বরং কোন কোন দিক থেকে আমরা তাঁকে তাদের চেয়েও বেশী সম্মান করি। আবার খৃষ্টানদের তুলনায় আমরা হযরত মসীহ্

(আঃ)-এর প্রকৃত রূপকে বেশী চিনি। সুতরাং এই ধরণের একটা অসম যুদ্ধে হিকমতের আরও বেশী প্রয়োজন !!

তবে প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই আক্রমণকে প্রতিহত করা যায় ?

প্রথমতঃ আমি আমার গত খুতবায় জামা'তকে বলেছিলাম যে, যদিও এই জঘন্য বইটাকে পড়া একটা সাংঘাতিক আধ্যাত্মিক আযাব, তথাপি যদি পাল্টা উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন গবেষক আলেমকে বইটা পড়তে হয় তবে সেটা হবে বাধ্য হয়ে পড়া। সেক্ষেত্রে حتى يخوضوا فى حديث غيره (অর্থাৎ অন্য কথা আরম্ভ না করা পর্যন্ত আলাদা থাক) এর শিক্ষা এখানে কার্যকরী নয়, কেননা, এখানে ইসলামের স্বার্থে একটা কষ্টদায়ক কাজ করতে হচ্ছে। যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা আহত হয়, পঙ্গু হয়, আবার প্রাণও বিসর্জন দেয়। এছাড়া উপায়ও নেই। সুতরাং খোদার খাতিরে কতিপয় গবেষককে এই কষ্ট সহ্য করতে হবে আর তাদেরকে বইটা বিশেষভাবে পড়ে এর বিস্তারিত বিষয়াদি জানতে হবে। সব ধরণের অপবাদগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে, তারপর ইসলামের ইতিহাসের আলোকে যাচাই করতে হবে যে সেগুলির কোন ভিত্তি আদৌ আছে কি নাই। তাদের ভিত্তি যদি অত্যন্ত দুর্বলও হয় তবুও সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। আবার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদসমূহকেও চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় এমন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হওয়া

উচিৎ যেগুলিতে এই সব নোংড়া অপবাদের খণ্ডন সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায় আর পাশ্চাত্যবাসীদেরকে বলা যায় যে, প্রকৃত-পক্ষে তারা অসৎ আর মিথ্যাবাদী এবং মনে কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

সভ্যতার যে পোষাক তারা পরে বেড়াচ্ছে, সেই সভ্যতা ও প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শিখিয়েছে। আবার তারা সম্পূর্ণ পোষাকও পরিধান করে নি। কেউ টুপি পড়েছে। আবার কেউ কেউ পাজামা পড়ছে। অর্থাৎ কেউ একটা অংশ নিয়েছে, কেউ অন্যটা নিয়েছে। এরা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামের সমস্ত শিক্ষার ছিলকা পরার চেষ্টা সত্বেও কয়েক জায়গা দিয়ে উলঙ্গও বটে। তাই, আজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ ইসলামী পোষাক পরিধান করে অর্থাৎ ইসলামী তাক্ওয়ার পোষাকে পূর্ণভাবে আবৃত ও তৈরী হয়ে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিতে হবে। তারপর আপনারা দেখতে পাবেন আল্লাহ্‌র কৃপায় শত্রুকে প্রতি ক্ষেত্রে কিভাবে পরাস্ত হতে হয়।

দ্বিতীয় প্রতিকার, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমান প্রধান দেশসমূহের সরকারগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সব সরকারকে এক্ষেত্রে আত্মাভিমান দেখানো উচিৎ। আর এমনভাবে নিজে-দের অসন্তোষ প্রকাশ করা দরকার যাতে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বুঝতে পারে যে, এটা একটা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতি তারা এই ধরণের হামলাসমূহকে সহ্য করবে না। কিন্তু এই অসন্তোষ প্রকাশ এমনভাবে হতে হবে যেন শত্রুরা এর দ্বারা

লাভবান না হয় এবং জগতকে ধোকা দিতে না পারে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে, তাতে শত্রুরা আরও সুযোগ হাতে পেয়েছে ; আর তারা জগতকে এর মাধ্যমে ধোকা দিচ্ছে। এমনকি তারা রাশিয়া আর জাপানে পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে খোমেনীর "রুশদী হত্যা ফত্ওয়ার" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। এই ধরণের ঘটনা সম্ভবতঃ এটাই প্রথম। একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধর্মীয় গোছের ফত্ওয়ার কারণে ইউরোপের ১২টা দেশ ইরানকে এক ঘরে করে বসেছে। তারপর আবার প্রেসিডেন্ট বুশও ঘোষণা করেছেন যে, এ ব্যাপারে আমরা ইউরোপকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এদের রাষ্ট্রদূতরা রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করেছে যেন তারাও ইরানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এমনকি অর্থনৈতিক সম্পর্কের অজুহাতে এরা মালয়েশিয়ার উপর একই চাপ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে যাতে করে ইসলামি দেশ হওয়া সত্বেও সে যেন এই ফত্ওয়ার কারণে ইরান থেকে নিজের দূত ফেরৎ আনে। জাপানের কাছে গিয়েছে আর তাকেও দূত ফেরৎ আনতে বলেছে। এ সকল দেশের ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়াটা বাহ্যতঃ রাজনৈতিক ব্যাপার। কিন্তু এমন কোন চোখ নেই যা চিনতে পারবে না যে, এই সব কিছুর পেছনে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রুতা অথবা ইরানের শত্রুতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যে স্থলে ইরানের শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়েছে, সেখানে ইসলামের উপর আক্রমণও

প্রকাশ পাচ্ছে। যখন মুসলিম বন্ধু দেশগুলি তাদের জিজ্ঞেস করে তখন তারা বলে, 'আমরা তো কেবল ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছি। ইসলামের শত্রুতা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।' আর যখন তাদের মিত্র দেশগুলি প্রশ্ন করে তখন তারা উত্তর দেয় যে, আমরা তো ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানার কোন সুযোগই হাতছাড়া করি না। আর এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় যে সুযোগটা এরা গ্রহণ করছে, সেটা হচ্ছে, সালমান রুশদীর বই এর নোংড়ামী আর জঘন্যতার উপর থেকে জগতের মনোযোগ এত চতুরতার সাথে সরিয়ে নিয়েছে যেন সেটা একটা পরোক্ষ বিষয় মাত্র। প্রকৃত ব্যাপার তো খোমেনী সালমান রুশদীর হত্যার ফত্ওয়া প্রদান করছে আর মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অথচ ইরান বৃটেনকে এই প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, 'তোমরা এই বইটার নিন্দা প্রকাশ কর আর এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ কর। তাহলেও আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হতে পারে' কিন্তু এরা বলল, 'এটা হতে পারে না। এই বই এর নিন্দা আমরা করব না।'

এইখানে এসে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীকে এরা জানাচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে খোমেনীর ফত্ওয়ার নিন্দা হওয়া উচিৎ, কি উচিৎ নয়? আর তাদের দাবী হল এই যে, খোমেনীর এই ফত্ওয়ার নিন্দা হওয়া উচিৎ। আর যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, যে নোংড়ামী আর অসভ্যতার কারণে খোমেনী সাহেব এ কাজটা করেছেন,

সেটার নিন্দা সম্বন্ধে তাদের মত কি? তখন তারা বলে এটা তো বাক্‌স্বাধীনতা, কলমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার।

যদি স্বাধীনতাই থেকে থাকে, তবে নোংড়া পুস্তকের নিন্দা করার বেলায় তাদের মুখে তালা লাগে কেন? একটা অশ্লীলতাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও কেন তারা এর নিন্দা করছে না? এখানে এসেই ইসলামের শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে যায়। আমি যে বিষয়টা পরিবেশন করছি সেটা নিছক একটা অপবাদ নয় বরং এদের কার্য-কলাপের ধরন-ধারণ স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, কেবল রাজনৈতিক শত্রুতা নয় বরং ইসলামের শত্রুতাও এ সব কিছুর মূলে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

এ পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিকার সম্ভব?

যে ধরণের অস্ত্র শত্রু পক্ষ ব্যবহার করে ঠিক সেই একই ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করা কুরআন করীম অনুসারে কেবল বৈধ নয় বরং আবশ্যকও। এ যুগে পাশ্চাত্যের কাছে দু'টো এমন অস্ত্র রয়েছে যেগুলি তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। একটা হচ্ছে বিশ্ববাসীর অভিমত নিজেদের স্বপক্ষে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্থ-

নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা। তাই দেখা যায় যখনই এরা কোন দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়, তখন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য জোটসমূহে চেষ্টা চালায় যেন সে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করা হয়। এ দু'টো অস্ত্র এদের কাছে সভ্য এবং বৈধ, এবং কেউ এগুলির বিরোধিতা করতে পারে না। ইসলামিক বিশ্ব আজ এ দু'টো অস্ত্র নিজেদের স্বপক্ষে কেন ব্যবহার করে না? নিজের মা'সুম (নিরপরাধ) মুসলমান-দেরকে পথে নামিয়ে গুলিতে ঝাঁঝড়া হতে না দিয়ে কেবল আক্রমণকারী শত্রুর উপরই আক্রমণ চালাও এবং সেই হাতিয়ার গুলিই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার কর যেগুলিতে সে পারদর্শী আর যেগুলি সে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলেছে।

সালমান রুশদীর এই বই এর ফলে যে বিশ্ব-অভিমত আমাদের স্বপক্ষে সায় দিত আজ আমাদেরই ভুল প্রতিক্রিয়ার কারণে সেই বিশ্ব-অভিমত তাদের পক্ষে চলে গেছে। অর্থাৎ অত্যাচারকারীও তারা আর অত্যাচারিতও যেন তারাই। আজ পৃথিবীর একটা বিশাল শক্তিশালী অংশ পাশ্চাত্যের সুকৌশল প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের কারণে মনে করছে যে মুসলমানরা আসলে অত্যাচারী আর পশ্চিমারা নির্যাতিত। কেননা তাদের প্রচারণা মতে এটা তো ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার দ্বন্দ্ব! এই দ্বন্দ্বে মুসলমানরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী আর পাশ্চাত্য সেই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট। অথচ বইটার নোংরামী অশ্লীলতা আর অবৈধ হামলা ১০০ কোটি মুসলমানের মনকে

যে অসহ্য মনঃকষ্ট দিয়েছে তাদের কাছে এর কোনই গুরুত্ব নেই। মুসলমান দেশগুলির কাছে ধনসম্পদ আছে। যদি তারা চায় অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমেও তারা পাল্টা জবাব দিতে পারে। আবার বিশ্ব-অভিমত অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সাথে একটা শক্ত কলম-যুদ্ধও লড়তে পারে। পাশ্চাত্যে এমন ভাল ভাল লেখক রয়েছেন, তাদেরকে যদি সময়ের এবং পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হয়, আর ব্যাপারটা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তবে এদের নিজেদের পত্র পত্রিকা সেই আওয়াজকে ধামাচাপা দিতে পারবে না। এখানে উঁচু দরের ভাল জাতের বুদ্ধিমান লেখক আছেন, তাদের সাথে যদি আরবের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলি যোগাযোগ করে অনতি-বিলম্বে পাল্টা উত্তর লিখতে উদ্বুদ্ধ করত, তাহলে বিশ্ব-অভিমতের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরণের রক্ষণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করা যেত। বইপত্র লেখানো যেতে পারত। অর্থ ব্যয়ে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালভাবে তুলে ধরা যেতে পারত। লোকেরা পার্থিব বিষয়াদির জন্য রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যাবলী লাভ করার জন্য সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। আর কখনো কখনো যদি সংবাদ-পত্র থেকে সাহায্য না পায়, তাহলে সংবাদ পত্রের মালিকানা কিনে নেয়। একবার এই ইংল্যাণ্ডেই ১৮৮৮ ইং এর কাছাকাছি সময়ের কথা। হিন্দুস্থানীয় একজন পারসী ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন।

তিনি ভাল বক্তা এবং লেখক ছিলেন এবং ইংরেজদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। তার ধারণা ছিল যে, জন-সাধারণ তার যোগ্যতার কারণে তাকে ভোট দিবে, তিনি জিতে যাবেন। নিজের সম্পর্কে তার এই ধারণা তো সঠিকই ছিল। কিন্তু তার এই বিশ্বাসটা ভুল ছিল যে, সেই জাতিটা তাকে এটা করতে দিবে। কেননা সে যুগে একজন হিন্দুস্থানী কাল ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন, ইংরেজদের কাছে তা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল! ঘটনা দাঁড়াল এই, যেদিন তিনি নির্বাচনী প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, সেদিন থেকে সমস্ত খবরর কাগজ তার খবর বয়কট করে বসল। একটা পত্রিকাও তার কোন সংবাদ ছাপাতো না। তখন তার ধনী পারসী পরিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং প্রভাবশালী পত্রিকাটাকে কিনতে হবে। তারা তখন সেই পত্রিকার অফিসে যোগাযোগ করে বলল, যদি তোমরা তোমাদের শেয়ার বিক্রি করতে চাও তবে আমরা কিনতে আগ্রহী। পরে তারা এতটা শেয়ার কিনে নিল যার ফলে পরিচালনা বোর্ডে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ফেলল। তারা ব্যবসায়ী ছিল বলে সম্পূর্ণ পত্রিকা না কিনে যতগুলি শেয়ার কিনার প্রয়োজন ছিল ততগুলি ক্রয় করেছিলেন। পরি-ণতিতে, সে দিনের পর তার খবরাখবর প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ হ'ল। আর তার পক্ষে সমানে লেখালেখি চলল। ফলে নির্বাচনে ১৭ ভোটে তিনি জয়লাভ করলেন। ইংল্যাণ্ডে সেই

যুগের সমাজে এর সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হল। একটা হিন্দু-স্থানী আমাদের দেশে এসে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে আমাদেরই পার্লামেন্টের মেম্বার বনে বসল! তাই তার বিরোধী পদপ্রার্থী আদালতে কেস দায়ের করলেন যে ভোট গণনায় ভুল হয়েছে। ফলে আদালত পুনরায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভোট গণনা করায়। তখন এই পারসী ভদ্রলোক ১৭ ভোটের স্থলে ২২ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। মানুষ দুনিয়ার জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ কাজ করে থাকে আর এর মাঝে দোষেরও কিছুই নেই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কাজে আপত্তি করতে পারে না।

অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু সউদী আরবের কথাই ধরুন। কেবল সউদী আরবের কাছে এত টাকা আছে যে সে যদি ইংল্যাণ্ডের সব পত্রিকা কিনে নেয় তারপরও সে বুঝতেও পারবে না যে তার ভাণ্ডারে কোন কমতি রয়েছে! তার কাছে এত অর্থ রয়েছে সেই অর্থের কেবল সুদ দিয়েই এদের সমস্ত পত্র-পত্রিকা সে কিনতে পারে। আমি আগেও বলেছি যে পাশ্চাত্য জাতি অন্যান্য যতই কারণ থাকুক না কেন, যদি তাদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক দিকটা বেশী লাভজনক প্রতীয়মান হয় তবে তারা অবশ্যই সেটাকে গ্রহণ করে। সউদী আরব যদি চায় তবে আজও এ কাজটা করতে পারে। সে পাশ্চাত্যের বড় বড় পত্রিকা কিনে তারপর সেগুলির মাধ্যমে সালমান রুশদীর এই আক্রমণের উত্তর প্রকাশ আরম্ভ করুক

আর পশ্চিমা জাতিকে প্রকাশ্যে জানাক যে, এই সব কর্মকাণ্ড ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে ইসলামের উপর অত্যন্ত জঘন্য আক্রমণ করা হয়েছিল, যার সুসভ্য ভাল উত্তর দেয়া সম্ভব।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। আজ ইসলামী বিশ্ব এত বেশী বিভক্ত যে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর পবিত্রতার উপর হামলার গায়রতও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না। ইরানের ইমাম খোমেনী সাহেবের একটা ভুল ফত্ওয়া প্রদানের অর্থ এই নয় যে, এই সমস্ত ব্যাপারে তার সঙ্গ ত্যাগ করতেই হবে। অথচ এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ১২ জন রাষ্ট্রদূতকে একই সময়ে ফেরৎ নিয়েছে। তার উপর আমেরিকা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানদের কথা একটুও না ভেবে, তাদের সমর্থন করে যাচ্ছে। মুসলমানদের উচিৎ ছিল ফত্ওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে অন্যান্য সকল বিষয়ে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা। পাশ্চাত্যকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল যে, যদি তোমরা এ কারণে খোমেনীর উপর আক্রমণ চালাও তবে আমরা খোমেনীর সঙ্গে থাকব। এটা যদি তোমাদের রাজনৈতিক যুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে মুসলিম বিশ্ব থেকে পৃথক করা যাবে না। আর যদি ধর্মীয় কারণে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে তবে আমরা তো সব কিছুর আগে মুসলমান। ধর্মীয় আত্মাভিমান আমাদেরকে এমন একটা বাঁধনে আবদ্ধ করে রেখেছে যেটা থেকে আমরা কোন মূল্যে পৃথক

হতে পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটা আরব দেশের প্রতিক্রিয়া এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। একবার খৃষ্টানরা উত্তর সিরিয়ার সীমান্ত দিয়ে হযরত আলী (রাঃ -এর রাজত্বের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেহেতু সে সময়ে হযরত আলী আর আমীর মোয়াবিয়ার মাঝে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল তাই খৃষ্টানদের ধারণা ছিল যে, আমরা আক্রমণ করলে আমীর মোয়াবিয়া আমাদের সাহায্য না করলেও হযরত আলী (রাঃ)-কে অন্ততঃ কোন সমর্থন দান করবে না। এক দীর্ঘ সময় ব্যাপী মুসলমানদের উত্তর সীমান্তে শত্রু পক্ষের সৈন্যরা সমবেত হতে থাকে। আমীর মোয়াবিয়া এই কথা জানতে পেরে রোমের সম্রাট সিজারের কাছে লিখে পাঠান ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আলীর রাজত্বকে দুর্বল মনে করে তোমরা তার রাজ্যকে আক্রমণ করতে চাও, আর তোমরা মনে করেছ যেহেতু মোয়াবিয়া আর আলী (রাঃ)-এর মাঝে মতানৈক্য চলছে তাই মোয়াবিয়া এই পরিস্থিতিতে আলীর সাহায্য করবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এই ধারণাটা মিথ্যা। এটা মুসলিম বিশ্বের গায়রতের প্রশ্ন! যদি তোমরা আক্রমণ কর তবে জেনে রেখ যে সৈন্যরা আলীর পক্ষে থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের প্রথম সারিতে মোয়াবিয়া থাকবে এবং তার সমস্ত শক্তিকে সে তখন হযরত আলীর সেবায় নিয়োগ করবে।

এটা এত শক্তিশালী চিঠি ছিল এবং এর প্রভাব এত বেশী হল যে, এর ফলে কোন ধরণের যুদ্ধই হয়নি। শত্রুরা বুঝতে পেরেছিল, ইসলাম বিশ্ব স্বীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম, সে অবস্থায় তার উপর কোন আক্রমণ ফলপ্রসূ হবে না। আফসোস! আজ সেই অপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা বিস্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। আজকে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইসলামের উপর চরম আক্রমণ সত্বেও, ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং একটা আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভা ডাকার প্রয়োজন। সেটা মক্কা কিংবা পাকিস্তানের ইসলামাবাদেই হোক অথবা ইরানে কিংবা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানেই হোক। একজন আহ্বানকারীর প্রয়োজন। আর প্রয়োজন এমন একটা স্থানের যেখানে মিলিত হওয়া সম্ভব। আজ, আল্লাহ্‌ ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার এটাই দাবী, যেন সমস্ত মুসলিম বিশ্ব লাব্বায়েক বলতে বলতে সেই নিমন্ত্রণকে গ্রহণ করে নির্ধারিত স্থলে সমবেত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানকে রক্ষা করব আর এই কাজ আমরা সম্পূর্ণভাবে কুরআন শরীফের শিক্ষার মধ্যে থেকেই করব। সে শিক্ষা

থেকে এক পাও এদিকসেদিক হব না। আমি বর্ণনা করেছি কুরআন করীম এ প্রসঙ্গে একটা সম্পূর্ণ বিধান দান করেছে। আর আমাদেরকে এমন একটা প্রতিরক্ষা যন্ত্রও দিয়েছে যার ব্যবহারে শত্রুরা যে সমস্ত অস্ত্র হাতে নিয়েছে সে সবগুলি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে। যেমন কোন কোন তলোয়ারের বিকট ঝঙ্কার ধ্বনি এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হয় যার ফলে অন্যদের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। তেমনি বিশ্ব-অভিমতের তলোয়ার যা এখন তাদের হাতে, যদি কুরআনের হিকমত অনুসারে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তাদের হাত থেকে এই তলোয়ার পড়ে যাবে। আজ আপনি দুর্বলতা দেখাচ্ছেন, কুরআনের অস্ত্র বলে এই অস্ত্রটা আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। তখন আপনি সমস্ত বিশ্ব-অভিমতকে প্রভাবিত করে বোঝাতে পারবেন ইসলাম বস্তুতঃ নির্যাতিত ও আক্রান্ত হয়েছে। আর আক্রমণকারী শত্রুদের এই আঘাত দেয়ার মাঝে কোন যথার্থতা নেই। ইসলামের শিক্ষা অনুসরণের মাঝেই ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শক্তি নিহিত। পক্ষান্তরে, ইসলামী শিক্ষার বাইরে অপরিকল্পিতভাবে বা এককভাবে পাল্টা আঘাত হানার অনুমতি ইসলাম দেয় না। বরং এ ধরণের আক্রমণের ফলে শত্রু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। এতে করে, আপনি নিজেও বদনাম কামাবেন আর ইসলামকেও বদনামের ভাগীদার করবেন। আপনার অলক্ষ্যে কুরআনকেও অপমান করবেন এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এরও দুর্নামের

কারণ হবেন। **কুরআন এক সম্পূর্ণ গ্রন্থ, একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধান একটি পরিপূর্ণ নেয়ামত। এর দ্বারা লাভবান হবার চেষ্টা করুন। তাই, আজ কুরআনের শিক্ষার সীমার ভিতরে থেকে, কুরআনের অস্ত্রগুলিকে হাতে নিয়ে নিজেদের আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান!**

কয়েকজন খৃষ্টান পাদ্রী সাহেব, যাদের মাঝে ভদ্রতাবোধ রয়েছে, ঘোষণা করেছেন যে আমরা আগামীতে পেঙ্গুইন সিরিজের কোন বই কিনবো না। এটা এত নোংড়া আর জঘন্য একটা আক্রমণ (অর্থাৎ স্যাটানিক ভার্সেস) যাকে কোনমতেই ব্যক্তি স্বাধীনতা আখ্যা দেয়া যায় না। বস্তুতঃ এই বইয়ে বাক্‌স্বাধীনতার অত্যন্ত জঘন্য অশ্লীল আর অসভ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। তাই বাক্‌স্বাধীনতাকে তলোয়ার দিয়ে না কেটে বরং বাক্‌স্বাধীনতার অবমাননাকারীকে (অর্থাৎ সালমান রুশদীকে) বিশ্বের সামনে এমনভাবে উলঙ্গ করুন আর এমনভাবে তার দোষগুলিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরুন যাতে করে সে আর কোন দিন নির্দোষ ও নিরীহ মানুষের উপর অপবাদ না দিতে পারে বরং তার মনের এবং চরিত্রের সমস্ত কলুষতা আর নোংড়ামী যেন মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। এই পদ্ধতিতে ইসলামী বিশ্বের পাল্টা জবাব দেয়া উচিৎ। আমি আশা করি পৃথিবীতে যেখানে যেখানে আহ্‌মদী নিজেদের প্রভাব রাখেন, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেভাবে আমি আপনা-

দের বুঝাচ্ছি সেভাবে সারা পৃথিবীতে কুরআনের আলোকে বিষয়টা বিষদভাবে তুলে ধরবেন। সরকারী পর্যায়ে যারা প্রভাব রাখেন তারাও নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে এই ঘটনাকে পরিষ্কার-ভাবে উপস্থাপন করুন। যেমন ধরুন কিছু আহ্‌মদী ভাল ভাল ডাক্তার এবং সার্জন সউদী আরবে অছেন। আর ছোট মোল্লাদের নজর যেহেতু সেখানে পড়ে নি তাই তারা সেখানে ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর যেহেতু তাঁরা চরিত্রবান ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী সেজন্য সমস্ত শক্তিশালী শাহযাদা তাঁদের সম্মান করেন এবং আহ্‌মদী জানা সত্বেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

সুতরাং আপনারা নিজেদেরকে দুর্বল জামা'ত মনে করবেন না। মনে করবেন না যে আপনাদের কোন প্রভাব নেই। আহ্‌মদীয়াত স্বীয় চরিত্র ও কর্মের শক্তিতে পৃথিবীতে একটা বড় ধরণের প্রভাব রাখে। এমনিভাবে বড় বড় সরকারের মধ্যেও আহ্‌মদীরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে একটা প্রভাব রাখে যেখানে আহ্‌মদীরা আটার মাঝে লবন পরিমাণও নেই। সুতরাং এই সমস্ত প্রভাব ও ক্ষমতাকে ইসলাম এবং হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বপক্ষে ব্যবহার করুন এবং পৃথিবীতে সর্বত্র একটা জোর আওয়াজ তুলুন। এমন কলরব সৃষ্টি করুন যা শত্রুদের আওয়াজকে না বাড়িয়ে বরং এমনভাবে রুদ্ধ করবে, যেন আগামীতে কেউ এভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস না করতে পারে। বিষয়টার

আর একটা দিক আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। কিছু সংখ্যক মুসলমান উলামা এবং রাজনৈতিক নেতা নির্বোধ এবং নির্দোষ মুসলমানদেরকে আবেগ প্রবণতার সুযোগে রাজপথে নামিয়ে তাদেরকে দিয়ে বিক্ষোভ করান। ফলে, তারা নিজেদের সৈন্যের হাতেই মারা পড়েন। এ ধরণের ঘটনা ইসলামাবাদ, করাচী, বোম্বাই ছাড়াও কোন কোন দেশে ঘটেছে। আর অনেক মুসলমান কেবল এই ধর্মীয় গায়রতের কারণে শহীদ হয়েছেন। এটা ঠিক যে, ইসলাম এ ধরণের বিপজ্জনক ও উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিক্রিয়ার অনুমতি দেয় না। কিন্তু এটাও সত্য যে, যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা এসবের কিছুই জানতেন না। তাদের বেশীর ভাগই নির্দোষ। কেবল হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সম্মান হানীকে মেনে নিতে না পেরে তাঁরা জীবিত থাকতে চান নি। তাঁরা অলিগলির সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদের মনে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এবং তাঁর ধর্মের গায়রত ছিল। যখন মৌলভীরা তাদেরকে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদার নামে হাঁক দেয় তারা তাদের সর্বস্ব অর্থাৎ খোলা বুক নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ে আর গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের পরিবারবর্গের দেখাশুনা করার কেউ নেই। এটা প্রাচ্যের একটা বড় দুর্ভাগ্য। নেতারা নিজেদের ঠিক-বেঠিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের থেকে কুরবানী গ্রহণ করেন, অথচ তাদেরকে রাজ পথে আর মাঠে কুরবাণীর পশুর

ন্যায় মারা পড়তে হয়। কিন্তু তাদের সন্তানদের দেখাশুনা করার কেউ থাকে না। এবারকার এই সব ঘটনা আমাদের সর্ব সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানের এবং তাঁর গায়রতের সাথে জড়িত। তাই আমি আহ্‌মদীয়া জামা'তকে নির্দেশ দিচ্ছি, তারা যেন এই পথে শাহাদত বরণকারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নেয়, তাদের অবস্থা জানে এবং তাদের কোন অভিভাবক আছে কিনা, খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। আর যদি জানতে পারা যায় যে, তাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তবে জামা'ত যাচাই করার পর অনতিবিলম্বে আমাকে জানাবে যে হিন্দুস্তানে কিংবা পাকিস্তানে কিংবা অন্যান্য স্থানে কোন্ কোন্ শহীদের পরিবারের অবস্থা শোচনীয় অথচ কেউ খোঁজ খবর নেয় না। হ্যাঁ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ)-এর প্রেমিক একটা জামা'ত নিশ্চয়ই আছে যে জামা'ত এদের অবশ্যই খোঁজ-খবর নিবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে শাহাদত বরণকারীদের পরিবারবর্গের অপমানিত হতে দিবে না।

খোদাতা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন। যে নিয়্যতে আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মানার্থে কুরবানী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা আমাদের শক্তি সামর্থ্য বাড়াতে থাকবেন এবং এই এতীম বাচ্চাদের এবং বিধবাদের দেখা শুনার তৌফিক দিবেন। আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর

নামে এদের খোঁজ-খবর নিব যিনি স্বয়ং পৃথিবীতে এতীমদের সবচেয়ে বেশী খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যিনি বিশ্বে এতীমদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন, যাদেরকে দেখা-শুনার কেউ ছিল না আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের দেখাশুনা করেছেন। তাই আজ তাঁর প্রেম ও ভালবাসা আমাদের কাছে দাবী রাখে যে, যারা তাঁর নামে প্রাণ দিয়েছে তাদেরও দেখাশুনা করা হোক। আর কেবল তারাই তাদের দেখাশুনা করবে যারা তাঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে একটা অটুট ও স্থায়ী ভালবাসা রাখে, কোন পার্থিক ব্যাপার যে ভালবাসার ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতা'লার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামায়াতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)